অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

মদন তপাদারের বাক্স

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



আনন্দ

মদন তপাদারের বাক্স • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ

মদন তপাদারের বাক্স

মদন তপাদারের বাক্স

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দেবাশীষ দেব



আ ন ন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩

ISBN 978-93-5040-255-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

MADAN TAPADARER BAKSO
[Juvenile Ficton]
by
Sirshendu Mukhopadhayay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

১০০.০০

“রা-স্বা”
বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রীশমীন্দ্র ভৌমিক
করকমলেষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার
অষ্টপুরের বৃত্তান্ত
উঁহু
কিশোর উপন্যাস সমগ্র ১-৩
কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড
গজাননের কৌটো
গোঁসাই বাগানের ভূত
গোলমেলে লোক
গৌরের কবচ
চক্রপুরের চক্করে
ছায়াময়
ঝিকরগাছায় ঝঞ্ঝাট
ঝিলের ধারে বাড়ি
ডাকাতের ভাইপো
দশটি কিশোর উপন্যাস
দুধসায়রের দ্বীপ
নবাবগঞ্জের আগন্তুক
নবীগঞ্জের দৈত্য
নৃসিংহ রহস্য
পটাশগড়ের জঙ্গলে
পাগলা সাহেবের কবর
পাতালঘর
বক্সার রতন
বটুকবুড়োর চশমা
বনি
বিপিনবাবুর বিপদ
ভুতুড়ে ঘড়ি
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি
মোহন রায়ের বাঁশি
রাঘববাবুর বাড়ি
ষোলো নম্বর ফটিক ঘোষ
সাধুবাবার লাঠি
সোনার মেডেল
হিরের আংটি
হেতমগড়ের গুপ্তধন

জমির দলিলটা বের করবেন বলে দুপুরবেলা মন্টুরামবাবু তাঁর দোতলার শোয়ার ঘরের মস্ত কাঠের আলমারিটা খুলতেই ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে একটা লোক বেরিয়ে এল। মন্টুরামবাবু তো হাঁ। এই পুরনো আর পেল্লায় আলমারিটা তাঁর ঠাকুরদার আমলের জিনিস। এর আগে কখনও তিনি আলমারি থেকে মানুষ বেরোতে দেখেননি। বছর খানেক আগে একবার একটা ইঁদুর বেরিয়েছিল বটে! আর এক-আধবার আরশোলা। কিন্তু মানুষ কখনও বেরোয়নি। তাই তিনি ভারী তাজ্জব হয়ে লোকটাকে দেখছিলেন।

লোকটা ভারী বেঁটেখাটো। সাড়ে চার ফুটের এদিক-ওদিক হবে, রোগাভোগা চেহারা। পরনে আঁট করে মালকোঁচা মেরে পরা ধুতি, গায়ে একটা কালচে রঙের পিরান আর গলায় মাফলারের মতো জড়ানো একটা লাল গামছা। বেরিয়েই লোকটা হাত-পা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "আর একটু হলেই তো খুনের মামলায় পড়ে যেতেন মশাই!"

মন্টুরাম এখনও ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা সামলে উঠতে পারেননি। কথাটা শুনে ভড়কে গিয়ে বললেন, "খুনের মামলা! বলো কী হে? হঠাৎ খুনের মামলায় পড়তে যাব কেন?"

"এই যে বারো ঘণ্টার উপর আমাকে আলমারির মধ্যে আটকে রাখলেন, তাতে তো এতক্ষণে আমার মরে কাঠ হয়ে যাওয়ার কথা। প্রাণায়াম-টানায়াম করা ছিল বলে প্রাণটা এখনও দেহ ছেড়ে বেরোয়নি। কিন্তু খিদে-তেষ্টা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে

নাকি! আগে একটু ঠান্ডা জল আর গরম দুধের ব্যবস্থা করুন দিকি। তারপর যা হোক চাট্টি মাছের ঝোল-ভাত হলেই চলবে। গায়ে মোটে জোরই পাচ্ছি না মশাই।"

মন্টুরামবাবুর মাথাটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। তিনি বললেন, "রোসো বাপু, আমার মাথার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা এখনও যায়নি। ব্যাপারটা আমাকে ধীরেসুস্থে বুঝতে দাও।"

লোকটা উবু হয়ে বসে ধুতির খুঁটে মুখ মুছে বলল, "তবে তো মুশকিলেই ফেললেন মশাই। খুনের মামলা থেকে বেঁচে গিয়ে কি শেষে ব্রহ্মহত্যার পাপে পড়বেন? খিদে-তেষ্টায় যে আমার প্রাণ যায়!"

"ব্রহ্মহত্যা! তুমি কি ব্রাহ্মণ নাকি?"

"তা ধরুন একরকম তাই। ব্রহ্ম কার ভিতরে নেই বলুন। ঝালে, ঝোলে, অম্বলে সর্বত্র রয়েছেন।"

"দাঁড়াও বাপু, আমার মাথাটা আরও গুলিয়ে দিয়ো না। আগে ব্যাপারটা বুঝতে দাও। আলমারি থেকে আস্ত একটা জ্যান্ত মানুষ বেরিয়ে এলে কার মাথার ঠিক থাকে বলো তো?"

লোকটা জুলজুলে চোখে মন্টুরামবাবুর দিকে চেয়ে বলল, "আজ্ঞে, সেই কথাটাই তো বলতে চাইছি। আলমারি থেকে জ্যান্ত বেরোলুম বলেই তো জোর বেঁচে গেলেন মশাই। ধরুন, যদি আমার বদলে আমার লাশ বেরোত, তা হলে যাবজ্জীবন না হয় তো ফাঁসি যে বাঁধা ছিল আপনার।"

মন্টুরামবাবু মিটমিট করে লোকটার আগাপাশতলা দেখে নিয়ে বললেন, "তুমি বেশ ঘোড়েল লোক দেখছি। আমার ঘরে ঢুকে আমারই আলমারির মধ্যে সেঁধিয়ে বসে রইলে, ফের আমাকেই ফাঁসির ভয় দেখাচ্ছ! তা বাপু, অত কথায় কাজ নেই। কানাই দারোগাকে খবর পাঠাচ্ছি, সে-ই এসে বুঝুক কার যাবজ্জীবন আর কার ফাঁসি হওয়া উচিত।"

এ কথায় লোকটা ভারী ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠল, "আজ্ঞে, দু'জন ভদ্রলোকের মধ্যে ভাল-মন্দ দুটো কথা হচ্ছে, তার মধ্যে দারোগা-পুলিশ এনে ফেলা কি ঠিক হবে বাবু?"

মন্টুরামবাবু একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, "ওহে বাপু, দারোগা-পুলিশ তো পরের কথা, তার আগে এ বাড়ির লোকেরাই কি ছেড়ে কথা কইবে বলে ভেবেছ? আমার তিন ভাই, সাত ভাইপো আর দুই ভাগনে রয়েছে যে, তারা সবাই বেজায় চড়া মেজাজের লোক। তাদের হাতে উত্তমমধ্যম খেয়ে যদি বা বেঁচে যাও, তারপরে আছে গাঁয়ের লোকের হাটুরে কিল। তারপরও কানাই দারোগার জন্য যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে না?"

লোকটা দেওয়ালঘড়ির দিকে চেয়ে হঠাৎ শশব্যস্তে বলে উঠল, "ইস, বেলা বারোটা বাজে! কথায় কথায় বড্ড দেরি হয়ে গেল কর্তা। বাড়ির সবাই ভাবছে। তা হলে...।"

"আহা, ব্যস্ত হওয়ার কী আছে? আলাপ-পরিচয় হল না, দুটো ভালমন্দ কথা হল না, হুট করে চলে গেলেই কি হয়? বলি, নাম কী তোমার?"

লোকটা হাল ছেড়ে দিয়ে একটা শ্বাস ফেলে বলল, "আজ্ঞে, সুধীর গায়েন নামটা কি চলবে?"

মন্টুরামবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "খুব চলবে। না চলার কী আছে? আমার মন্টুরাম নাম যদি চলে গিয়ে থাকে, তা হলে তো সেই তুলনায় সুধীর দিব্যি নাম।"

"যে আজ্ঞে, সবাই তাই বলে বটে, সুধীর নামটা নাকি বড্ডই ভাল। বেশ ঠান্ডা, সুস্থির নাম। এখন আপনার পছন্দ হলেই হল।"

"না না, নাম আমার পছন্দই হয়েছে হে। তবে কিনা কানাই দারোগার পছন্দ হলেই হয়।"

সুধীর একগাল হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তা হলে কথাবার্তা

তো সব হয়েই গেল, এবার বরং রওনা হয়ে পড়ি! রোদটা এর পর বড্ড চড়ে যাবে, পথও তো কম নয়!"

"বাপু সুধীর, এ বাড়িতে ঢোকা যত সহজ, বেরোনো তত সোজা নয়।"

সুধীর আঁশটে মুখে বলে, "ঢোকাটাও যে খুব সহজে হয়েছে, তা মোটেই নয়। প্রথমে দু'-দুটো সড়ালে কুকুর!"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, বাঘা আর হালুম।"

"তারপর একটা রাক্ষসের মতো চেহারার পাহারাদার।"

"ওই হল রঘু পালোয়ান।"

"তারপর ডাইনির মতো চেহারার তিনটে ঝগড়ুটে বুড়ি।"

"হেঃ হেঃ, তেনারা আমার তিন পিসি, সর্বদা চতুর্দিকে নজর রাখেন।"

"একজন বিচ্ছিরি রাগী চেহারার সিড়িঙ্গে বুড়ো।"

"ঠিক চিনেছ, উনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় খুড়োমশাই। তা বাপু, তোমার বেশ এলেম আছে দেখছি। এত লোককে ফাঁকি দিয়ে এ বাড়িতে ঢোকা তো সোজা কথা নয়!"

"আজ্ঞে, ঢুকতে আমার কালঘাম বেরিয়ে গিয়েছে। তবে কিনা বাঁকাবাবার কাছে গা-ঢাকা দেওয়ার বিদ্যেটা শেখা ছিল বলে রক্ষে। তবে শেষরক্ষে বলেও একটা কথা আছে। সেইটেই যা হল না। আপনার মতো আনাড়ির কাছে ধরা পড়ে যেতে হল।"

"তবেই বোঝো, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে কি না।"

সুধীর ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলে, "খুব নড়ে কর্তা, খুব নড়ে। আর ওই ধর্মের কলে বাতাস দেওয়ার জন্যই তো আমার আসা কিনা।"

মন্টুরাম একটু থতমত খেয়ে বলেন, "তার মানে? তুমি আবার কোন ধর্মের কলে নাড়া দিতে এলে হে? চোর-ডাকাতদেরও



আজকাল ধর্মের নাড়ি টনটনে হয়ে উঠেছে নাকি?”

“তা উঠবে না? চোর-ডাকাতেরও ধর্ম আছে কর্তা। এ লাইনে কি বিপদআপদ কম নাকি? ধর্ম না মানলে চলে?”

“তা বটে। কথাটা ভেবে দেখার মতো। তা বাপু সুধীর, কোন ধর্ম কর্ম করতে এ বাড়িতে ঢুকেছিলে, বলো তো!”

“আজ্ঞে, খিদে পেলে খাওয়াটাও তো ধর্ম, নাকি কর্তা?”

“তা তো বটেই।”

“আমিও ওই পেটের ধর্ম পালন করতেই বিপদ ঘাড়ে করে এই বাড়িতে ঢুকেছিলুম মদন তপাদারের হারানো বাক্সটার খোঁজে। কড়ার ছিল, বাক্সটা উদ্ধার করতে পারলে হাজার পাঁচেক টাকা পাওয়া যাবে।”

মন্টুরাম কিছুক্ষণ হাঁ করে সুধীরের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, “কে মদন তপাদার? আর কীসেরই বা বাক্স, এসব আবোল তাবোল হেঁয়ালি বলে পার পাবে ভেবেছ?”

সুধীর হাতজোড় করে বলে, “আজ্ঞে, অপরাধ নেবেন না। এসব আমার কথা নয়। আমাকে যেমন বলা হয়েছিল, তেমনই বলছি।”

“হেঁয়ালি ছেড়ে ঝেড়ে কাশো তো বাপু।”

“কাশছি, কাশছি। শুনেছিলুম যেন, বছর দশেক আগে জাদুকর মদন তপাদার এক সন্ধেবেলায় আপনার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন।”

“বলি, মদন তপাদারটা কে বটে হে? নামটা জীবনে শুনেছি বলেই তো মনে হচ্ছে না।”

“আজ্ঞে, তিনি ধনপতি বা হুডিনি নন, নিতান্তই গেঁয়ো আর গরিব এক জাদুকর। গাঁয়েগঞ্জে, হাটে-বাজারে ঘুরে-ঘুরে ম্যাজিক দেখাতেন। পসার টসার তেমন ছিল না। হতদরিদ্র অবস্থা। ছেঁড়া পাতলুন, তালি দেওয়া জামা, তাপ্পি মারা জুতো, এই ছিল তাঁর

পোশাক। তবে একটা টুপি পরতেন। তাঁর ধারণা ছিল, টুপি পরলে বোধহয় কেষ্টবিষ্টুর মতো দেখায়। রোগা, সিড়িঙ্গে চেহারার মানুষ, মনে পড়ছে কি কর্তা?"

"না হে বাপু, মনে পড়ছে না। মনে পড়ার কথাও নয়। ওরকম বিটকেল চেহারার কোনও লোককে জীবনে দেখিনি।"

সুধীর উদাস গলায় বলে, "আপনি যদি বলেন তো তাই। তবে কিনা কালোবাবু অন্য কথা বলেন।"

"কালোবাবুটা আবার কে?"

"তা কে জানে কর্তা। চাদর মুড়ি দিয়ে ঘোরেন, হাটে-বাজারে দেখা হয়, দাড়ি-গোঁফ আছে, ব্যস, এইটুকু জানি।"

"তা তিনি কী বলেন শুনি!"

"তা তিনি বলেন যে, সেই রাতে আপনি তাকে দাওয়ায় শুতে দেন। তবে তিনি নাকি বাক্সটা আপনাকে দিয়ে বলেছিলেন, 'মশাই, এই বাক্সখানায় আমার যথাসর্বস্ব আছে, চুরি হয়ে গেলে পথে বসব। রাতের মতো বাক্সটা আপনার হেফাজতে থাক।' মনে পড়ছে কি কর্তা?"

"না হে বাপু, লোকটাকেই মনে পড়ছে না তো বাক্স। তা সেই বাক্সে ছিলটা কী?"

"আজ্ঞে, সে কথা কালোবাবু বলেননি। তিনি শুধু বলেছেন যে, ওই বাক্সটা তাঁর চাই-ই চাই।"

মন্টুবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "এঃ, মামার বাড়ির আবদার আর কী! মদন তপাদারের বাক্স কি ছেলের হাতের মোয়া যে, চাইলেই পাওয়া যাবে!"

"আজ্ঞে, আমিও তো কালোবাবুকে সেই কথাই বলেছি।"

"কী বলেছ?"

"বলেছি, মন্টুরামবাবু বড্ড হুঁশিয়ার লোক। বাক্সখানা তাঁর

হেফাজত থেকে বের করে আনা ভারী শক্ত কাজ হবে।”

মন্টুরামবাবু আকাশ থেকে পড়ে বললেন, “অ্যাঁ! আমার কাছে বাক্স! ইয়ার্কি মারার আর জায়গা পাওনি? বাক্স-ফাক্স আমার কাছে নেই। মদন তপাদার নামে কাউকে আমি কস্মিনকালেও চিনি না।”

ঘাড় কাত করে সুধীর ভালমানুষের মতো বলে, “তাই বলে দেবখন।”

“হ্যাঁ, বোলো। আর এ কথাটাও বলে দিয়ো যে, ফের কোনও বেয়াদপি দেখলে তাকে পুলিশে দেব।”

“যে আজ্ঞে। তবে থানা-পুলিশ তো কালোবাবুর জলভাত কিনা। তাঁর নামে সাতটা খুনের মামলা ঝুলছে!”

চোখ বড় বড় করে মন্টুবাবু বলেন, “সাতটা খুনের মামলা! সে তো ডেঞ্জারাস লোক হে!”

“খুব খুব! ডেঞ্জার বলে ডেঞ্জার, তার অ্যাঙ্গারও সাংঘাতিক। অ্যাঙ্গারের উপর অ্যাঙ্গার, কাঁধে বন্দুক, পকেটে পিস্তল, কোমরে ছোরা। খেপে গেলেই রক্তারক্তি। এমন ডেঞ্জার আর অ্যাঙ্গার লোক দুটো দেখিনি মশাই। মদন তপাদারের বাক্স না পেলে আমার গর্দান কি আস্ত থাকবে?”

গলাটা একটু নামিয়ে মন্টুরামবাবু বললেন, “কেন হে বাপু, সেই বাক্সে আছেটা কী? সোনাদানা, হিরে-জহরত তো আর নেই, তিন প্যাকেট তাস, গোটা কয়েক লোহার বল, কয়েকটা চোঙা, একটা খেলনা পিস্তল আর বিটকেল সব হাবিজাবি জিনিস। একজন হাটুরে জাদুকর তো আর বাক্সভরতি মোহর নিয়ে ঘুরে বেড়াত না রে বাপু!”

ঘাড়টা নেড়ে কথাটায় সায় দিয়ে সুধীর বলল, “যে আজ্ঞে, তা হলে কালোবাবুকে গিয়ে তাই বলব যে, আপনি বাক্সখানা ভাল করে নেড়ে-ঘেঁটে দেখেছেন। তাতে তিন প্যাকেট তাস, খেলনা

পিস্তল, লোহার বল, চোঙা আর বিটকেল কিছু জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই। এই তো! তা বাবু, বাক্সখানা সাবধানে রাখবেন কিন্তু।"

মন্টুরামবাবু হঠাৎ হুংকার দিয়ে উঠলেন, "বাক্স! কীসের বাক্স? কোথায় বাক্স? কার বাক্স? কবেকার বাক্স? বাক্স বললেই হল? বাক্স কি গাছে ফলে? কোথাকার কোন মদন তপাদার, তার কীসের না কীসের বাক্স, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা কীসের হ্যাঁ? বাক্সে কী আছে তা কি আমার জানার কথা? সেই বাক্স চোখেই দেখলুম না।"

সুধীর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, "আজ্ঞে, সে তো ঠিক কথাই। মদন তপাদারের বাক্স নিয়ে আমাদের মতো মনিষ্যির মাথাব্যথা কীসের? তবে কিনা কালোবাবু, ল্যাংড়া গেনু, ফুটু সর্দাররা ওই বাক্সটার জন্য বড়ই হন্যে হয়ে পড়েছে।"

মন্টুবাবু হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "ল্যাংড়া গেনু আর ফুটু সর্দার আবার কোথা থেকে উদয় হল?"

"আজ্ঞে, তাঁরা উদয় হয়েই আছেন। শ্রদ্ধাস্পদ কানাই দারোগামশাই এই দু'জনের যাতে সন্ন্যাস রোগ বা সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়, তার জন্য হটুগঞ্জের জাগ্রত কালীবাড়িতে দু'জোড়া পাঁঠা মানত করে রেখেছেন। এই আক্রার বাজারে দু' জোড়া পাঁঠার দামটাও একটু ভেবে দেখুন। তা হলেই বুঝতে পারবেন এ দু'জনের এলেম কত।"

"তুমি কি বলতে চাইছ, এই দু'জনেও মদন তপাদারের বাক্সের খদ্দের?"

"পরিপাটি বুঝতে পেরেছেন মশাই। বাক্সের তল্লাশে তিন পক্ষই আসরে নেমেছেন। তিনজনের যে-কোনও সময়ে খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে। তা হলেই ভেবে দেখুন, মদন তপাদারের বাক্সখানা কী সাংঘাতিক জিনিস!"

মন্টুরামবাবু ভারী বিরক্ত হয়ে হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভাব করে বললেন, "দূর, দূর! আহাম্মক আর কাকে বলে। বাক্স বলতে তো একটা পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া চামড়ার সুটকেস! তার মধ্যে বোকা লোকদের বুরবক বানানোর সব এলেবেলে সস্তা জিনিস! ওর জন্য কেউ হেঁদিয়ে মরে নাকি? ছ্যা ছ্যা! তুমি বরং গিয়ে ওদের বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বোলো যে, ও বাক্সে তেমন কিছু নেই। ওদের কেউ ভুল খবর দিয়েছে।"

"সে বলবখন। ছেঁড়াখোঁড়া চামড়ার পুরনো একটা সুটকেস তো? তা বাক্সটা কতটা বড় হবে বলুন তো কর্তা!"

মন্টুরামবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "তার আমি কী জানি! সুটকেস কি আমি দেখেছি নাকি? চামড়ার বাক্স না টিনের বাক্স, তা কি আমার জানার কথা? আবোল তাবোল বকে আমার মাথাটা আর গুলিয়ে দিয়ো না তো বাপু। কোথাকার কোন মদন তপাদার আর তার কোন না-কোন সুটকেস? ভাল জ্বালা হল দেখছি।"

ঠিক এই সময়ে মন্টুরামবাবুর গিন্নি হরিমতী ঘরে ঢুকে আঁতকে উঠে বললেন, "ওমা! এটা আবার কে গো?"

মন্টুরামবাবু ভারী তেতো গলায় বললেন, "আর বোলো না, এটা একটা চোর।"

হরিমতী ড্যাবড্যাব করে খানিকক্ষণ সুধীর গায়েনের দিকে চেয়ে দেখে হঠাৎ ভারী আহ্লাদের গলায় বললেন, "ওমা! কী সুন্দর ছোট্টখাট্টো পুতুল-পুতুল চোর গো! কেমন গোপাল গোপাল চেহারা। ইচ্ছে করছে, আমার পুতুলের আলমারিতে সাজিয়ে রাখি!"

একথা শুনে সুধীর ককিয়ে উঠে হাতজোড় করে বলে, "না মাঠান, আলমারিতে আর না, আলমারি বড় ভয়ংকর জিনিস।"

মন্টুরামবাবু গম্ভীর গলায় হরিমতী দেবীকে বললেন, "আর

আশকারা দিয়ো না তো। একে পুলিশে দেব।"

হরিমতী মন্টুরামের দিকে তাকিয়ে ঝংকার দিয়ে বললেন, "পুলিশে দিলেই হল! তুমি পাষণ্ড আছ বাপু। এই একরত্তি একটা চোরকে কেউ পুলিশে দেয়?"

"চোরের আবার ছোট-বড় কী? সাইজ যাই হোক, চোর তো!"

"মোটেই না! এইটুকু একরত্তি চোরটা পুলিশের হাতে মার খেলে বাঁচবে নাকি? পুলিশগুলোর যা গোদা গোদা চেহারা! না বাপু, তোমার মায়া-দয়া না থাক, আমার আছে।"

মন্টুরামবাবু ভারী বিরক্ত হয়ে বললেন, "কী মুশকিল। চোর-ছ্যাঁচড়কে প্রশ্রয় দিলে যে দেশটা অরাজকতায় ভরে যাবে! একরত্তি দেখতে বটে, কিন্তু সাংঘাতিক লোক, সারা রাত আলমারির মধ্যে ঘাপটি মেরে ছিল।"

হরিমতীর চোখ ছলছল করে উঠল, "আহা রে, তবে তো বাছার খুবই কষ্ট গিয়েছে। খিদে-তেষ্টায় মুখ শুকিয়ে একেবারে হত্তুকি। এসো তো বাছা, পেট ভরে ভাত খেয়ে যাও। চোর বলে কি আর মানুষ নয়।"

এই বলে হরিমতী সুধীরের নড়া ধরে টেনে নিয়ে চলে গেলেন।

মন্টুরামবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে করতে বলতে লাগলেন, "কী মুশকিল! কী মুশকিল! এরকম চলতে থাকলে চোর-ডাকাতরা কি আর বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইবে? এ বাড়িতেই থাবা গেড়ে বসে থাকবে যে!"

ঘরের মধ্যে নীরবেই দ্রুত পায়চারি করছিলেন মন্টুরাম। খুব চিন্তিত, কপালে ভাঁজ।

ঠিক এই সময় শুনতে পেলেন, কে যেন বলে উঠল, "মন্টুরাম!"

মন্টুরাম চমকালেন না, কারণ গলাটা তিনি বিলক্ষণ চেনেন। এ

হল দু'নম্বর মন্টুরামের গলা। দু'নম্বর মন্টুরামের সবচেয়ে বড় দোষ হল, সে প্রায়ই মন্টুরামকে উপদেশ দেওয়ার জন্য হাজির হয়।

মন্টুরাম অত্যন্ত তিক্ত গলায় খ্যাঁক করে উঠলেন, "কী চাই?"

"কাজটা তুমি ঠিক করোনি মন্টুরাম।"

"কোন কাজটা?"

"মদন তপাদারের বাক্সটা হাতিয়ে নেওয়াটা তোমার ঠিক হয়নি।"

"ঠিক হয়নি মানে? মদন তপাদার যে আমার নতুন সাইকেল, পিতলের ঘড়া, দেওয়ালঘড়ি আর এক পাঁজা বাসন চুরি করেছিল!"

"মন্টুরাম, তুমি ভালই জানো, ওসব মোটেই মদন তপাদার চুরি করেনি।"

"তবে কে করেছিল?"

"তা কে জানে! যে-ই করুক, মদন তপাদার নয়।"

"তাকেই সবাই সন্দেহ করেছিল। তার ভাগ্য ভাল যে, আমরা তাকে পুলিশে দিইনি।"

"কিন্তু ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আর বাক্সটাও তাকে ফেরত দাওনি।"

"আহা, বাক্সের যা ছিরি, ওটা বিক্রি করলেও আমার চুরির জিনিসের দাম উঠত না।"

"কিন্তু বাক্সখানার কদর যে বেড়েছে মন্টুরাম। ও বাক্সে যা আছে, তার যে অনেক দাম!"

"দূর দূর! ও ছাইভস্মের আবার দাম কী?"

"আছে হে মন্টুরাম, আছে। তোমার মতো পাপী-তাপীরা ওর মর্ম বুঝবে না হে।"



মাঝরাতে হরিশ্চন্দ্র চোখ চেয়েই আঁতকে উঠে চেঁচালেন, "ওরে করিস কী? করিস কী? ও যে সব্বোনেশে কাণ্ড! হাত ফসকে যদি আমার গায়ে এসে পড়িস, তা হলে যে আমার বুড়ো হাড় একটাও আস্ত থাকবে না!"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! লোকটা দেঁতো একটা হাসি হেসে দিব্যি ফের এক ঝাড়বাতি থেকে ঝুল খেয়ে শূন্যে দুটো ডিগবাজি দিয়ে অন্য ঝাড়বাতিটায় গিয়ে দোল খেতে লাগল। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন হরিশ্চন্দ্র। কিন্তু তাতেও কি শান্তি আছে! ফের চোখ খুলতেই সেই একই দৃশ্য। লোকটা এবার ওই ঝাড়বাতি থেকে লাফ মেরে শূন্যে চরকির মতো কয়েকটা পাক খেতে লাগল। হরিশ্চন্দ্র আর্তস্বরে বললেন, "ওরে বাপু, ট্রাপিজের খেলা দেখাতে চাস তো বাগানে মেলা গাছপালা রয়েছে, সেখানে যা না! এই বুড়ো মানুষটার বুকের উপর কেন?"

লোকটা অবশ্য পড়ল না। দিব্যি অন্য ঝাড়বাতিটায় গিয়ে ঝুলে এক গাল হেসে বলল, "কেমন খেলা রাজামশাই?"

হরিশ্চন্দ্র কাতরস্বরে বললেন, "এ কি তোর সার্কাসের তাঁবু পেয়েছিস বাপু? ঝাড়বাতি যে বড্ড পলকা জিনিস। লাফঝাঁপের ধাক্কা কি সইতে পারবে? ভেঙে পড়লে রক্তারক্তি কাণ্ড হবে যে!"

হরিশ্চন্দ্রের খাটের উপর, উঁচুতে একটা সিলিং পাখা ঝুলে

আছে। সারানো হয়নি বলে এখন আর চলে না। লোকটা ঝাড়বাতি ছেড়ে এক লাফে গিয়ে পাখাটার উপর পা ঝুলিয়ে বসল। আতঙ্কিত হরিশ্চন্দ্র ইষ্টনাম জপ করতে করতে বললেন, "নাঃ, দেখছি অপঘাতেই আমার প্রাণটা যাবে।"

লোকটা ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে বলে, "বুঝলেন রাজামশাই, আমি একসময় নামকরা ট্রাপিজের খেলোয়াড় ছিলুম। একবার অসাবধানে পড়ে গিয়ে বাঁ হাতটা ভেঙে গিয়েছিল বলে ছেড়ে দিতে হল।"

"তা বাপু, ওসব হুড়যুদ্ধের খেলায় যাওয়ার দরকারটাই বা কী তোমার? দুনিয়ায় কি আর কোনও খেলা নেই? ফুটবল-টুটবল খেলো, ব্যাট-বল খেলো, তাস বা পাশা না হয় লুডু খেললেও তো হয় রে বাপু।"

"ট্রাপিজের খেলায় ভারী মজা রাজামশাই, ও আপনি বুঝবেন না। খেলাটা ছেড়ে দিতে হল বলেই শেষে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতাম।"

"ভাল রে বাপু, খুব ভাল। ম্যাজিকও কিছু খারাপ নয়।"

"দেখবেন নাকি রাজামশাই?" বলেই লোকটা ওই উঁচু থেকে সোজা হরিশ্চন্দ্রের খাটের উপর লাফ দিয়ে নামল। হরিশ্চন্দ্র "বাবা রে, গেছি রে!" বলে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। লোকটার অবশ্য ভ্রুক্ষেপ নেই।

হরিশ্চন্দ্রের দু'ধারে দু'পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠিক তার বুকের উপর ছ'-সাতটা লোহার বল লোফালুফি করতে লাগল।

হরিশ্চন্দ্র হাউমাউ করে উঠলেন, "সামলে বাপু, সামলে! এ যে প্রাণঘাতী খেলা রে বাবা! কেমন বেআক্কেলে লোক হে তুমি! রাজা-গজাদের বিছানায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছ যে বড়! রাজার কি সম্মান নেই?"

লোকটা বলগুলো লোফালুফি করতে করতেই বলল, "আপনি আর কীসের রাজা? রাজত্ব নেই, মন্ত্রীসান্ত্রি নেই, হাতি-ঘোড়া নেই। কেউ মানেও না আপনাকে।"

হরিশ্চন্দ্র ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "রাজা না হোক, বুড়ো মানুষ বলেও তো একটু মায়া করতে হয় রে বাপু। ওই লোহার বল একটাও যদি হাত ফসকে পড়ে, তবে কি আমি বাঁচব?"

লোকটা নির্বিকার ভাবে বল লুফতে লুফতে বলে, "ভয় নেই রাজামশাই, আমার হাত থেকে বল ফসকায় না। এই দেখুন, বলগুলো সব উপরে ছুড়ে ছেড়ে দিচ্ছি, সব অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

বলতে বলতেই লোকটা একের পর-এক বল উপরে ছুড়ে দিয়ে খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেল। হরিশ্চন্দ্র সভয়ে দেখলেন, বলগুলো সোজা তাঁর উপর নেমে আসছে। একটা বল এসে পড়ল কপালে, দ্বিতীয়টা নাকে, তিন নম্বরটা বুকে, চার নম্বরটা পেটে, আর দুটো কোথায় পড়ল কে জানে। হরিশ্চন্দ্র বললেন, "ওরে বাবা রে! মাথাটা গেল! নাকটা আর নেই রে! বুকটা তো ভেঙে চুরমার, পেটটা ফুটো হয়ে গিয়েছে রে!"

হরিশ্চন্দ্র চোখে অন্ধকার দেখলেন। তারপর গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন গা বরফের মতো ঠান্ডা, নাকে হাত দিয়ে দেখলেন, উঁহু, শ্বাস বইছে না। নাড়ি টিপে দেখলেন, নাড়ি থেমে গিয়েছে, বুকে হাত দিলেন, না, ধুকপুকুনি নেই।

হরিশ্চন্দ্র হাউরে মাউরে করে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, শিগগির আয়। আমি যে মরে কাঠ হয়ে গিয়েছি। মড়া বাসি হওয়া কি ভাল রে! তাড়াতাড়ি আয়। এটা কি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোনোর সময়! একটা লোক মরে গেল আর তোদের হুঁশ নেই? মুখাগ্নি করার জন্য একটা দেশলাই দে বাপ, কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি, দেরি হলে অনর্থ হবে যে!"

চেঁচামেচি শুনে বুড়ো রাখহরি, মোক্ষদা, নগেন সব কাজের লোকেরা হাজির।

"কী হল বুড়োকর্তা, চেঁচাচ্ছেন কেন?"

"তোদের আক্কেলটা কী বল তো! শ্মশানবন্ধুদের সব ডেকে আন, মড়ার খাট কিনতে লোক পাঠিয়ে দে।"

"বালাই ষাট! আপনার হয়েছে কী?"

"মরে গিয়েছি তো! এই দ্যাখ নাড়ি বন্ধ, শ্বাস নেই, গা ঠান্ডা, ধুকপুকুনি হচ্ছে না।"

রাখহরি বলল, "গা তো দিব্যি গরম, শ্বাসও চলছে, নাড়িও ঠিক আছে। কিছু হয়নি আপনার।"

"হয়নি! নাকটা ভেঙে গিয়েছে না?"

মোক্ষদা ঝংকার দিয়ে বলল, "নাক ভাঙুক আপনার শত্তুরদের।"

হরিশ্চন্দ্র চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে বললেন, "তবে লোহার বলগুলো কোথায় পড়ল বল তো!"

"কীসের লোহার বল?"

"ওই যে লোকটা লোহার বল লোফালুফি করতে করতে হঠাৎ ছেড়ে দিল!"

"আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন। এখন ঘুমোন তো।"

সকালবেলা হরিশ্চন্দ্র তাঁর জরির পোশাকটা পরে বাগানে পায়চারি করছিলেন। পোশাকের জরি অবশ্য প্রায় সবই খসে গিয়েছে, কাপড়টাও ঝ্যালঝ্যালে হয়ে এসেছে। পুরনো ঠাটবাট আর কিছুই বজায় রাখা যাচ্ছে না। তবু বড্ড মায়া। এই পোশাকটা তাঁর ঠাকুরদা পরেছেন, বাবা পরেছেন, তাই তিনিও পরেন। বাগানটাও আর বাগানের মতো নেই। আগাছা, চোরকাঁটায় ভরতি। পাথরের ফোয়ারাটা কেতরে পড়ে আছে। তবু তো বাগান।

একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, আচমকা একটা লোক তাঁর পথ আটকে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বলল, "প্রাতঃপ্রণাম বুড়োকর্তা।"

হরিশ্চন্দ্র একটু অবাক হয়ে বলেন, "তুমি কে হে বাপু? কী চাও?"

"আজ্ঞে, বলছিলুম কী, আপনার বাড়িতে একটা ছোটখাটো কাজ হয়?"

হরিশ্চন্দ্র বিলক্ষণ জানেন যে, আজকাল তিনি ভুল দেখেন, ভুল শোনেন, ভুল বোঝেন এবং ভুল বলেও ফেলেন। তাই খুব সতর্ক হয়ে তিনি লোকটাকে দেখে নিয়ে বললেন, "বাপু হে, আগে এ বাড়িতে জুতো পরিয়ে দেওয়ার লোক ছিল, ঘামাচি গেলে দেওয়ার লোক ছিল, চুল আঁচড়ে দেওয়ার লোক ছিল, এমনকী, গোঁফে তা দিয়ে দেওয়ার জন্যও লোক ছিল। কিন্তু সেই দিন আর নেই হে।"

লোকটা ভারী খুশি হয়ে বলে, "আজ্ঞে, আমি ওসব কাজ খুব ভালই করতে পারি কর্তা।"

হরিশ্চন্দ্র বিরস মুখে বললেন, "ওরে বাপু, জুতো পরাবে কাকে? আমার তো মোটে এই এক জোড়া হাওয়াই চপ্পল সম্বল। বয়স হওয়ার পর শীত-গ্রীষ্ম সব সময়েই কেমন শীত শীত করে বলে আমার ঘামও হয় না, ঘামাচিও নেই। আর চুল আঁচড়াতে চাইলেই তো হবে না, চুল কোথায়? দেখছ না, মাথাজোড়া টাক? আর গোঁফে উকুন হয়েছিল বলে বছর চারেক আগেই হারাধন হাজাম আমার গোঁফ কামিয়ে সাফ করে দিয়ে গিয়েছে। তা দেবে কোথায়?"

"রাজামশাই, আমি যে অনেক দূর থেকে বড় আশা করে এসেছিলুম।"

হরিশ্চন্দ্র ফের পায়চারি শুরু করে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "না হে ভালমানুষের ছেলে, আমি তো আশা-ভরসা কিছুই দেখছি না।"

"তা রাজামশাই, আপনার রসুইকর লাগে না? আমি রোগন জুস, দম পুক্ত, মুর্গ মসল্লম, কাবাব, বিরিয়ানি, চাইনিজ, মোগলাই সব রাঁধতে পারি।"

হরিশ্চন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "আহা, কতকাল ওসব শব্দ শুনিইনি! কী যেন বললে বাপু? রোগন জুস, কাবাব, বিরিয়ানি?"

"যে আজ্ঞে।"

হরিশ্চন্দ্র হাতটা উলটে মাথাটা নাড়া দিয়ে বললেন, "স্বাদ-সোয়াদ ভুলেই গিয়েছি।"

"একবার ট্রাই দিয়ে দেখুন কর্তা, ফাটিয়ে দেব।"

"ওরে ভালোমানুষের পো, পেটে যে কিছুই সয় না বাপ। মোক্ষদা দু'বেলা গ্যাঁদাল পাতা দিয়ে কাঁচকলার ঝোল রেঁধে দেয়। সেই আমার পথ্যি। একদিন এক টুকরো পাঁঠার মাংস খেয়ে ফেলে সে কী আইঢাই! না হে বাপু, ও লাইনে সুবিধে নেই তোমার।"

লোকটা হরিশ্চন্দ্রের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে বলল, "তা হলে তো বড় মুশকিলে পড়া গেল মশাই। আমি যেন শুনেছিলুম, রাজা-গজাদের মেলাই লোকলশকর লাগে! আর এই চৈতন্যপুরের রাজবাড়িতে নাকি মোটে পাঁচজন কাজের লোক। তারাও সব বুড়োধুড়ো হয়ে পড়েছেন। তাই ভাবলুম, আপনার একজন কমবয়সি কাজের লোক হলে বোধহয় ভালই হয়।"

হরিশ্চন্দ্র ঠোঁট উলটে বললেন, "কাজের আছেটাই বা কী বলো তো! আমি তো বাপু, সারাদিন শুয়ে-বসে থাকা ছাড়া কোনও কাজই খুঁজে পাই না। তুমিই কি পাবে?"

লোকটা সোৎসাহে বলল, "কাজ মেলাই জানি বুড়োকর্তা, গাছ বাইতে পারি, জল তুলতে পারি, মাটি কোপাতে পারি, কাপড় কেচে ইস্তিরি করতে পারি, পাঞ্জাবি গিলে করতে পারি, তারপর

বাজার-হাট বলুন, ফাইফরমাশ বলুন, সব কাজে পাকা। দরকার হলে লাঠি চালাতে পারি, বন্দুক ফোটাতে পারি।”

হরিশ্চন্দ্র থমকে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ করে লোকটাকে দেখে নিয়ে বললেন, “ওরে বাবা, তোমার তো অনেক বিদ্যে হে! কিন্তু এত গুণের কদর করতে পারি, আমার কি আর সেই সঙ্গতি আছে? আমার কাজের লোকেরা কত বেতন পায় জানো? গত পঞ্চাশ বছর ধরে তারা ত্রিশ টাকা করে মাইনে পায়। তাও সব মাসে হাতে পায় না। মাঝেমধ্যেই বাকি পড়ে যায়।”

লোকটা ভারী অবাক হয়ে বলে, “ত্রিশ টাকা! ত্রিশ টাকা কি কম হল মশাই? ঠিক মতো দরাদরি করে কিনলে যে ত্রিশ টাকায় জাহাজ কেনা যায় রাজামশাই।”

হরিশ্চন্দ্র বুঝতে পারছেন, তিনি ভুল শুনছেন। প্রায়ই শোনেন। তবু ভ্রু কুঁচকে বললেন, “জাহাজ বললে নাকি বাপু?”

“যে আজ্ঞে। আমাদের গাঁয়ের গৌর গড়গড়ি তো তিন টাকায় হাতি কিনে ফেলেছিল।”

হরিশ্চন্দ্র ডান কানে আঙুল দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে হতাশ মাথা নেড়ে বললেন, “নাহ, কানটাই গিয়েছে দেখছি!”

লোকটা সোৎসাহে বলল, “গৌর গড়গড়ি এমন দরাদরি করেছিল যে, হাতিওয়ালা দরাদরির চোটে মূর্ছা যায়। মূর্ছা ভাঙার পর তার মাথা এমন ভ্যাবলা হয়ে গিয়েছিল যে, তিন টাকায়ই হাতিটা বেচে দিয়ে মনের দুঃখে নিরুদ্দেশে চলে যায়। বুঝলেন তো রাজামশাই, ত্রিশ টাকায় হিসেব মতো দশটা হাতি কিনে ফেলাও বিচিত্র নয়। ত্রিশ টাকা যদি বেশি বলে মনে হয়, তা হলে আমাকে না হয় আপনি কুড়ি টাকাই দেবেন।”

হরিশ্চন্দ্র বললেন, “কুড়ি টাকা! ঠিক শুনছি তো!”

“ঠিকই শুনছেন। আমার একটু টানাটানি হবে বটে, কিন্তু

আপনার দিকটাও তো দেখতে হবে। রাজবাড়ির যা অবস্থা দেখছি, তাতে ওর বেশি চাইলে ধর্মে সইবে না।”

হরিশ্চন্দ্র খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বললেন, “আরও কথা আছে বাপু, এ বাড়ির খাওয়াদাওয়া তেমন সুবিধের নয়। কচু-ঘেঁচু দিয়ে একটা ঝোল আর মোটা চালের ভাত।”

লোকটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে বলে, “ভাতের সঙ্গে ঝোল! বলেন কী রাজামশাই! সে তো রাজভোগ! আমার তো ভাত-পাতে একটু নুন-লঙ্কা হলেই চলে।”

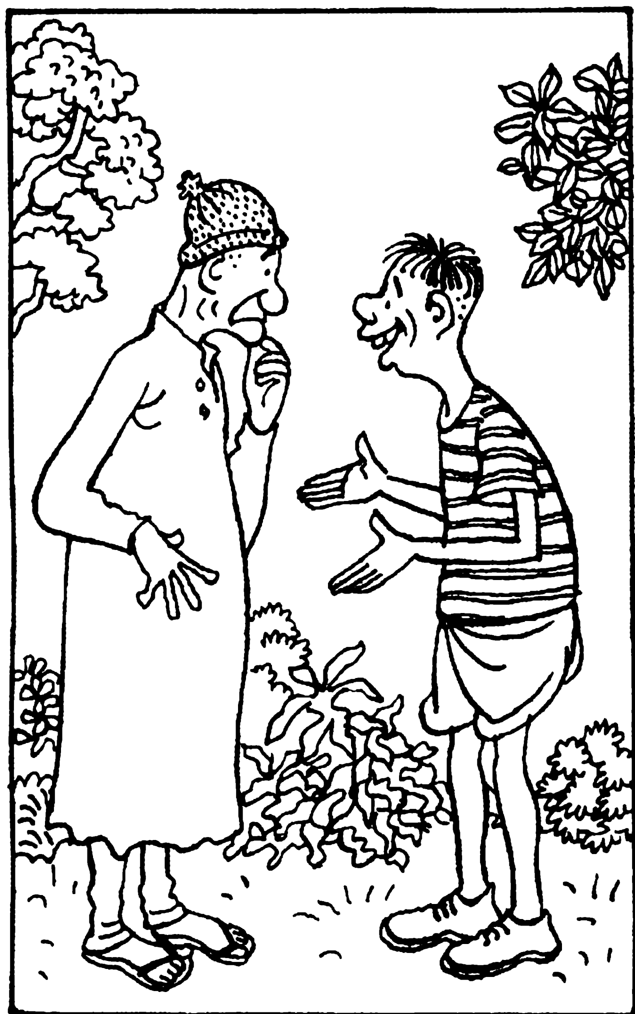
হরিশ্চন্দ্র হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, “বুঝেছি বাপু, তোমার একটা মতলব আছে।”

ছোকরা ভারী লাজুক হেসে মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, “এ বয়সেও কর্তামশাইয়ের চোখের নজর আছে বটে! ঠিকই ধরেছেন কর্তা, একটু বিষয়কর্মেই চৈতন্যপুরে আসা। শুনেছিলুম, চৈতন্যপুরের রাজবাড়ি হল অবারিত দ্বার।”

হরিশ্চন্দ্র আর একটা শ্বাস মোচন করে বললেন, “ঠিকই শুনেছ বাপু, অবারিত দ্বারই বটে। সিংহদরজার লোহার ফটক কবেই ভেঙে পড়ে গিয়েছে। বাড়ির বেশিরভাগ দরজারই খিল নেই। জানলার কপাট উধাও। গোরু-ছাগল, কুকুর-বেড়াল, চোর-ছ্যাঁচড় সবই ঢুকে পড়ছে। এমন অবারিত দ্বার আর কোথায় পাবে। তবে কিনা গা ঢাকা দেওয়ার পক্ষে জায়গাটা মন্দ নয়। তোমার বোধ হয় সুবিধেই হবে।”

ছোকরা তাড়াতাড়ি হরিশ্চন্দ্রের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে একগাল হেসে বলল, “আজ্ঞে, ওই ভরসাতেই আসা কিনা। আমার নাম হীরেন গণপতি। হিরু বলেই সবাই ডাকে।”

ছোকরা চোর বা ডাকাত, ফেরারি আসামি বা উগ্রবাদী, খুনি বা গুন্ডা কি না তা কে জানে! কিন্তু হলেই বা, হরিশ্চন্দ্রের কী-ই বা



যায় আসে। এই বাড়িতে স্বদেশি আমলেও ছেলে-ছোকরা ঢুকে বোমা বাঁধত। অন্তত দু'বার দুটো জেল-পালানো ডাকাত কাজের লোক সেজে ঢুকেছিল, পরে খুঁজে খুঁজে পুলিশ এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়। এত বড় একটা বাড়ি সামাল দেওয়ার মতো লোকবল তাঁর কই? তাই তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মাত্র।

কিন্তু মাঝরাতে এক বিপত্তি। খ্যানখ্যানে গলায় কে যেন ডাকছিল, "ও হরি! বলি হরিশ্চন্দ্র কি শুনছিস! কী কুম্ভকর্ণের ঘুম রে বাবা তোর! বলি ওদিকে যে সব্বোনাশ হয়ে গেল, সে হুঁশ আছে?"

হরিশ্চন্দ্র ধড়মড় করে উঠে দ্যাখেন, তিন ডাইনি বুড়ি খাটের তিন দিকে দাঁড়িয়ে কটমট করে তাঁকে দেখছে। হরিশ্চন্দ্র অবশ্য ঘাবড়ালেন না। এই তিনজনকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন। ছেলেবেলা থেকেই। তিনজনেই দেড়শো বছর আগে গত হয়েছে। কিন্তু এ বাড়ির মায়া কাটাতে পারেনি। মাঝে মাঝেই উদয় হয়ে নানা বায়নাক্কা তোলে। হরিশ্চন্দ্র শশব্যস্তে বললেন, "কী হয়েছে পিসিমাগণ?"

কানা পিসির একটা চোখ কানা বটে, কিন্তু আর-এক চোখের নজর এমনই সাংঘাতিক যে, অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। কানা পিসি ঝংকার দিয়ে বলল, "বলি, তুই এই সসাগরা পৃথিবীর রাজা, চারদিকে তোর এত ধন্যি ধন্যি, সেই তুই কিনা যাকে-তাকে রাজবাড়িতে সেঁধুতে দিচ্ছিস বাবা! চৈতন্যপুরের রাজবাড়ি কি শেষে ধর্মশালা হয়ে উঠবে নাকি?"

কুঁজো পিসির পিঠের কুঁজ যত বড়ই হোক, তেজ কিছু কম নয়। চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, "চৈতন্যপুর হল গিয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রাজ্য। আর তুই হলি রাজচক্রবর্তী। সেই তোরই শেষে মতিচ্ছন্ন

হল! ছোঁড়াটা যদি আমাদের গয়নাগাঁটির খোঁজে এসে থাকে, তা হলে কী হবে বল তো?"

খোঁড়া পিসির এক ঠ্যাং খোঁড়া বটে, কিন্তু মেরুদণ্ড খাড়া আর গলার জোর সবচেয়ে বেশি। ঝংকার দিয়ে বলল, "লোকে বলে মহারাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্র হল গে একটা রাজার মতো রাজা। যেমন বুদ্ধি, তেমন বিবেচনা। তা কোথায় কী? এরপর তো রাজবাড়িতে হাট-বাজার বসে যাবে।"

কানা পিসি এবার গলাটা একটু নরম করে বলে, "হ্যাঁ রে হরি, বলি আমাদের তিন-চার হাজার ভরির গয়না, তিন কলসি হিরে-জহরত, সাতশো আকবরি মোহর কার জন্য আগলে রেখেছি বল তো! তুই ছাড়া আমাদের আছেটা কে? তোকেই সব দিয়ে থুয়ে যাব বলেই না সব সময় ভয়ে-ভয়ে থাকি, অন্য কেউ এসে না লুটেপুটে নিয়ে যায়। তা বাছা, এইসব অজ্ঞাতকুলশীলকে কি প্রাসাদে ঢোকাতে আছে?"

সোনাদানার গল্প সেই ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছেন হরিশ্চন্দ্র। পিসিমারা নাকি তাঁকেই সব দিয়ে যাবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি পয়সাও উপুড়হস্ত করেনি। এতকাল খুব আশায়-আশায় ছিলেন, কিন্তু এখন আশা ক্ষীণ হতে হতে উবে যেতে বসেছে। তবে এদের তিনি চটাতেও সাহস পান না। কী জানি যদি সত্যিই একদিন লুকোনো সোনাদানা বের করে দেয়! তা হলে কী হবে? অনেক ভেবে দেখেছেন হরিশ্চন্দ্র। সোনাদানা পেলে এই বয়সে তিনি এক জোড়া নরম দেখে বিদ্যাসাগরী চটি কিনবেন, একটা ঝলমলে দেখে জরির জোব্বা, দাঁতগুলো বাঁধিয়ে নেবেন, আর দু'বেলা ভাতের পাতে একটু আমসত্ত্ব খাবেন। এর বেশি ভাবতে তাঁর ভরসা হয় না।

হরিশ্চন্দ্র হাতজোড় করে বললেন, "পিসিমাগণ, আপনারা

নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের সোনাদানা খুঁজে বের করার মতো মনিষ্যি এখনও জন্মায়নি। সেই গ্যাঁড়া সর্দারের কথা মনে নেই? সে আমাদের সবাইকে বেঁধে রেখে দক্ষিণের ঘরের মেঝে খুঁড়ে গর্ত করেছিল! তা আপনারা তো মাটিচাপা দিয়ে তাদের মেরেই ফেলেছিলেন প্রায়। বাড়িতে একটা অপঘাত হতে যাচ্ছে দেখে রাখহরি তাদের উদ্ধার করে।"

কুঁজো পিসি ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, "তবু বাপু, সাবধানের মার নেই। ছোঁড়াটা বড্ড চালাক-চতুর। চোখ দুটো যেন চারদিকে চরকির মতো ঘুরছে। মতলব মোটেই ভাল বুঝছি না।"

খোঁড়া পিসি ঝংকার দিয়ে বলে, "কার মতলবই বা ভাল দেখছিস লা? দুনিয়াতে কি আর ভাল লোক আছে? নাদু মালাকার তো এখনও মেটে হাঁড়ি নিয়ে এ বাড়ির আড়ায়-আড়ায় আমাদের ধরবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালও দেখেছি, পিছনের ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে আসশ্যাওড়ার আড়াল থেকে নজর দিচ্ছে। হ্যাঁ রে হরি, সত্যি করে বল তো, আমাদের ধরার জন্য নাদু তোকে কত টাকা দিতে চেয়েছে?"

হরিশ্চন্দ্র আমতা আমতা করে বলেন, "বেশি নয় পিসিমাগণ, নাদু মাত্র তিন হাজার টাকা কবুল করেছিল।"

কানা পিসি তার এক চোখ কপালে তুলে বলে, "মাত্র তিন হাজার! কী ঘেন্নার কথা! বাব্বাঃ, আমাদের দাম নাকি তিন হাজার! গলায় দড়ি।"

কুঁজো পিসি ফুঁসে উঠে বলে, "ড্যাকরার মুখখানা ভেঙে দিতে পারলি না রে হরি! আমরা হলুম গে চৈতন্যপুরের মহারাজাধিরাজের পিসি! সোজা পাত্তর তো নই রে বাপু!"

হরিশ্চন্দ্র কাতর কণ্ঠে বলেন, "রাগ করবেন না পিসিমাগণ।

নাদুর ধারণা আপনারা ডাইনি। আর ডাইনির আত্মা দিয়ে নাকি অনেক কাজ হয়।”

কানা পিসি বলে, “অ্যাঁ! তার এত আস্পদ্দা!”

কুঁজো পিসি বলে, “ছোট মুখে এত বড় কথা!”

খোঁড়া পিসি বলে, “ওরে পিঁপড়ের পাখা গজিয়েছে।”

হরিশ্চন্দ্র কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, “না না, সে কথা আমি তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছি। বলেছি, ওঁরা মোটেই ডাইনি ছিলেন না। ছয় পুরুষ আগেকার লতায়-পাতায় সম্পর্ক বটে, কিন্তু হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, আমরা পিসি আর ভাইপোই বটে। সে একটু গাঁইগুঁই করছিল বটে, বলছিল, মরার পর আর কীসের পিসি, কীসের ভাইপো! তা আমি তাকে বলে দিয়েছি, আমার পূজনীয়া পিসিমাদের দিকে যেন সে আর নজর না দেয়।”

কানা পিসি বলে, “ওরে, আমাদের হিসেব একেবারে পাকা। শুধু ভাইপোই নোস, আমাদের একমাত্র ওয়ারিশান।”

কুঁজো পিসি বলে, “আহা, শুধু ওয়ারিশান কেন, ও তো আমাদের নয়নের মণি!”

খোঁড়া পিসি বলে, “তা তো বটেই, এখনও যেন সেই ফুটফুটে খোকাটি।”

তিন পিসি ফুস করে বাতাসে উধাও হয়ে গেলে হরিশ্চন্দ্র একটু জল খেলেন। তিনি জানেন যে, তিনি ভুল দেখেন, ভুল শোনেন, ভুল বোঝেন এবং ভুল বলেও ফেলেন। কিন্তু এই ভুলভুলাইয়ার মধ্যেই তাঁকে ঘুরপাক খেতে হবে। ব্যাপারটা তাঁর তেমন খারাপও লাগে না। তবে কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক, তা নিয়ে একটু গণ্ডগোল হয় বটে।

এই যেমন কিছুদিন আগে নাদু ওঝা এক সকালবেলায় এসে তাঁর সামনে একটা মেটে হাঁড়ি রেখে পেন্নাম করে বলল, “কর্তামশাই,

হাঁড়ির মধ্যে বটের আঠা আর বন্ধনমন্ত্র মাখিয়ে দেওয়া আছে। তিনটি হাজার টাকা দিচ্ছি, ওই তিন ডাইনিকে ভুলিয়েভালিয়ে হাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিন, আমি সরা চাপা দিয়ে নিয়ে যাব।"

হরিশ্চন্দ্র একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কী হবে?"

নাদু বলল, "তারপর অনেক প্রক্রিয়া আছে। তিনজনকে ওই হাঁড়ির মধ্যে মজিয়ে শোধন করে যখন বের করব, তখন একেবারে মাটির মানুষ। যাই বলব, তাই লক্ষ্মী ছেলের মতো করবে।"

হরিশ্চন্দ্রের একবার ইচ্ছে হয়েছিল, তিন খিটকেলে বুড়িকে বেচেই দেন। এই বাজারে তিন হাজার টাকা কিছু কম নয়। দোকানে ধার-বাকি আছে, কাজের লোকের বেতন বকেয়া পড়ে আছে, গয়লা তাগাদা দিচ্ছে। তারপর ভেবে দেখলেন, পিসিমাগণ তাকে দীর্ঘদিন ধরে গয়নাগাটি, হিরে-জহরত আর মোহরের লোভ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু উপুড়হস্ত করছে না। তবু একটা ক্ষীণ আশাও তো আছে। নাদু মালাকারের খপ্পরে গিয়ে পড়লে আশাটুকুও থাকবে না। গয়নাগাটিও ওই গাপ করবে।

হরিশ্চন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, "না হে বাপু, পিসি বিক্রি করা আমার কর্ম নয়। ওতে মহাপাপ।"

নাদু হাঁ হাঁ করে উঠে বলে, "আহা, সে তো জ্যান্ত পিসি কর্তামশাই। মরা পিসি, তাও লতায়-পাতায় সম্পর্ক, বেচতে দোষ কী?"

"মাত্র তিন হাজার টাকায় পিসিদের বিক্রি করে দেব, আমি কি সেরকম পাষণ্ড নাকি?"

নাদু দুঃখের সঙ্গে বলল, "দরটা কি কম মনে হল কর্তামশাই? বাজার ঘুরে দেখে আসুন গে, পিসির দর কত করে যাচ্ছে। পিসি প্রতি হাজার টাকায় আপনার মোটেই ঠকা হচ্ছে না।"

হরিশ্চন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "না হে বাপু, পিসি বেচলে মহাপাতক। নরকবাস। পরকালের কথাটাও তো খেয়াল রাখতে হবে কিনা? তুমি বাপু, এসো গিয়ে।"

"দরটা না হয় আর একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি কর্তা। তাতে আমার লোকসান যাবে অবশ্য, তা যায় যাবে।"

কিন্তু হরিশ্চন্দ্র রাজি হননি। নাদু মালাকার মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল বটে, কিন্তু সে হাল ছাড়েনি। হরিশ্চন্দ্র মাঝেমধ্যেই খবর পান, নাদু একটা মেটে হাঁড়ি নিয়ে প্রাসাদের আদাড়ে-পাদাড়ে ঘুরঘুর করে বেড়ায়।

হরিশ্চন্দ্র সকালের পায়চারি সেরে সামনের চওড়া বারান্দায় একটা কেঠো চেয়ারে রোদে পা মেলে দিয়ে বসে আছেন। শরৎকাল। মোলায়েম হাওয়া দিচ্ছে। চারদিকে মৌমাছির গুনগুন শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিচিত্র সব পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। আকাশে মেঘ আর রোদের খেলা। হরিশ্চন্দ্রের একটু ঢুলুনি মতো এসে গেল।

ঠিক এই সময়ে হিরু গণপতি একটা বন্দুক নিয়ে এসে হরিশ্চন্দ্রকে প্রণাম করে পায়ের কাছে বসল। হরিশ্চন্দ্র সভয়ে চেয়ে বললেন, "বন্দুক কীসের হে?"

একগাল হেসে হিরু বলে, "আজ্ঞে, লোহালক্কড়ের ঘরে একটা টিনের বড় বাক্সে পুরনো জিনিসপত্রের মধ্যে পড়েছিল রাজামশাই। মরচে পড়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু খাঁটি বিলিতি জিনিস। মেহনত করে ঘষে-মেজে নিলে এতে এখনও কাজ হয়। এসব জিনিস কি অযত্নে ফেলে রাখতে হয় কর্তা?"

হরিশ্চন্দ্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বললেন, "ওই বন্দুক আমার বাপ-ঠাকুরদা চালাতেন বটে, আজকাল আর দরকার হয় না বলে পড়ে আছে।"

হিরু বন্দুকটার গায়ে আদর করে একটু হাত বুলিয়ে বলল, "যা

দিনকাল পড়েছে কর্তামশাই, তাতে কোথা দিয়ে কোন বিপদ আসে তার ঠিক কী? একটা অস্ত্র থাকা তো ভালই।"

হরিশ্চন্দ্র প্রমাদ গুনে বললেন, "ওরে বাপু, ওইসব বিপজ্জনক জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করা মোটেই ভাল কথা নয়। ওতে আমাদের কাজ কী?"

"তা হলে খুলেই বলি রাজামশাই, এই হিরু গণপতির পিছনে পিছনেই বিপদ ঘোরে। এই তো দু' মাস আগে মনসাপোতার জঙ্গলে কালোবাবুর দল আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। তারপর ফুটু সর্দারও আমার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনেছি।"

আতঙ্কিত হরিশ্চন্দ্র বললেন, "কেন বাপু, তুমি করেছটা কী?"

"সে অনেক কথা রাজামশাই। তবে আমি যখন এসে পড়েছি, তখন বিপদের অভাব হবে না।"



পাথরপোঁতার বাঁকা মহারাজকে ভয় খায় না, এমন লোক কাছেপিঠে পাওয়া ভার। তার কারণও আছে। বাঁকা মহারাজ হয়কে নয় করতে পারেন, কালোকে সাদা, দিনকে রাত করলেন তো পুন্নিমেকে অমাবস্যা। বাঁকা মহারাজের মহিমা শুনে শুনে কয়েক বছর আগে সুধীর গায়েন মহারাজের নজরানা বাবদ পঞ্চাশটা টাকা কোনওমতে জোগাড় করে পাথরপোঁতায় গিয়ে হাজির হয়েছিল।

একেবারে পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "বাবা, বেঁটে বলে কেউ পাত্তা দেয় না, মান্যিগণ্যি করে না, ভাল করে তাকিয়েও দ্যাখে না। মনে বড় কষ্ট বাবা। অন্তত ছয় ফুট লম্বা করে দিন। এই তো সেদিন ভজনবাবুর বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়লুম। তা ভজনবাবু দরজা খুলে চারদিক দেখে 'কোথায় কে' বলে দরজা প্রায় বন্ধই করে দিচ্ছিলেন। এরকম সব হচ্ছে বাবা। অপমান আর সইছে না।"

বাঁকা মহারাজ চিন্তিত মুখে তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "লম্বা হতে চাস?"

"যে আজ্ঞে। নইলে গলায় দড়ি দেব।"

বাঁকা মহারাজ বাঁকা হেসে বললেন, "কোন দুঃখে লম্বা হতে যাবি রে? মানুষ যত বেঁটে হয়, তার তত বুদ্ধি। লম্বা হতে চাস তো এক তুড়িতেই তোকে লম্বা করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে কী হবে জানিস তো! মাথার যত রসকষ টেনে নিয়ে তোর শরীরটা ঢ্যাঙা

হবে। তখন ভ্যাবলা হয়ে যাবি, বোকা হয়ে যাবি, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে চারদিকের কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝতে পারবি না। লোকে বলবে, ওই দ্যাখ, একটা হাবাগোবা ঢ্যাঙা লোক যাচ্ছে।"

কথাটা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে বসে সুধীর বলে, "তা হলে কি আমি বেশ বুদ্ধিমান লোক বাবা?"

"তা নোস তো কী? বামন অবতারের কথা শুনিসনি? বামন ভগবান তো তোর চেয়েও বেঁটে ছিল। তা বলে ক্ষমতা কম ছিল কি? রাম বেঁটে, কৃষ্ণ বেঁটে, হিটলার বেঁটে, নেপোলিয়ন বেঁটে। ওরে দুনিয়াটা তো বেঁটেদেরই হাতে।"

সুধীর তবু দোনামোনা করে বলে, "কিন্তু লোকে যে আমাকে মোটে লক্ষ্যই করে না বাবা! বড় অপমান লাগে যে!"

"দূর পাগল, লোকের নজরে থাকা কি ভাল! সব সময় মানুষের নজরদারিতে থাকলে যে কাজকর্মে খুবই অসুবিধে। বরং বেঁটে বলে গা-ঢাকা দিয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে পারবি। বেঁটে হওয়া তো ভগবানের আশীর্বাদ রে! কত লোক বেঁটে হওয়ার জন্য আমার কাছে এসে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকে।"

সেই দিনই সুধীরের চোখের সামনে থেকে যেন একটা পরদা সরে গেল। তাই তো! বেঁটে হওয়ার সুবিধের দিকগুলো তো তার এতদিন নজরে পড়েনি! এই যে গোপাল সাধুখাঁর বাড়ির ঘুলঘুলি দিয়ে ঢুকে সে ক্যাশবাক্স সরিয়ে আনল, লম্বাচওড়া হলে পারত কি? কালীতলার সুখলাল শেঠের গদিতে ধরা পড়তে পড়তেও যে বেঁচে গেল, সে শুধু বেঁটে বলেই না! সুখলালের ছেলেটা তো ধরেই ফেলেছিল প্রায়, চড়চাপড়ও কষিয়েছিল কয়েকটা। কিন্তু সবই হাওয়া কেটে বেরিয়ে গেল। শেঠবাড়ির বড় নর্দমার ফুটো দিয়ে চম্পট দিতে তার তো কোনও অসুবিধেই হয়নি!"

সে তাড়াতাড়ি বাঁকা বাবাকে পেন্নাম করে বলল, "বাবা,

আপনার আশীর্বাদে আমি যেন চিরকাল বেঁটেই থাকি।"

তা বাঁকা মহারাজের আশীর্বাদে সুধীর এখনও বেঁটেই আছে। আর বেঁটে থাকার আনন্দে তার মনটা মাঝে-মাঝে বড়ই উচাটন হয়। সাবধানের মার নেই বলে সে মাঝে-মাঝেই গিয়ে গোবিন্দপুরের হারু দর্জিকে দিয়ে নিজের মাপ নিয়ে আসে। গত হপ্তাতেই হারু তার মাপ নিয়ে বলল, "না রে, তুই সেই চার ফুট তিন ইঞ্চিই আছিস।"

মাঝেমধ্যে অবশ্য একটু দুশ্চিন্তা হয়। চার ফুট তিন ইঞ্চিটা কি একটু বেশিই লম্বা হয়ে গেল না! এতটা লম্বা হওয়া কি ভাল? বাসন্তী সার্কাসের জোকার হরগোবিন্দ মাত্র আড়াই ফুট। আর চরণগঙ্গার জটেশ্বর চার ফুটের চেয়েও কম। ষষ্ঠীতলার নগেন পাল চার ফুট এক ইঞ্চি। তা হলে কি সে লম্বাদের দলেই পড়ে গেল? আর একটু বেঁটে হলে কি ভাল হত না! আবার এও ভেবে দ্যাখে যে, বাঁকা মহারাজ যখন তাকে বেঁটে বলেছে, তখন সে নির্ঘাত বেঁটেই। তাই সুধীর মাঝে মাঝে গুনগুন করে গায়,

"বড় যদি হতে চাও, বেঁটে হও তবে।
দুনিয়াটা একদিন বেঁটেদেরই হবে।
বেঁটে যার পিতামাতা, বেঁটে যার ভাই,
তার মতো ভাগ্যবান আর কেহ নাই।
বেঁটেগণ যতজন আছে এই ভবে।
একত্রিত হলে তারা দুধেভাতে রবে।
বেঁটে পায়ে হেঁটে হেঁটে যাবে বহু দূর।
দুনিয়া লুটিয়া তারা আনিবে প্রচুর।
জয় বেঁটে, জয় বেঁটে, বেঁটেদের জয়।
বেঁটে হয়ে বেঁচে থাকো সদানন্দময়।"

লম্বা-চওড়া লোক দেখলে আজকাল সুধীরের করুণাই হয়। বেচারারা জানে না, লম্বা হয়ে কী ভুলটাই না করেছে।

বেশ আনন্দেই ছিল বটে সুধীর। কিন্তু তার মতো মনিষ্যিদের একটা দিন ভাল যায় তো পরের দিনটাই খারাপ। আজ পুন্নিমে তো কালই অমাবস্যা। মন্টুরামের হাতে হেনস্থা হওয়ার পর থেকে সবাই দুয়ো দিচ্ছে তাকে। এমন কথাও বলছে যে, আলমারির মধ্যে দম বন্ধ হয়ে মরে গেলেও নাকি সে শহিদের সম্মান পেত আর মোটা ক্ষতিপূরণও আদায় হত। না মরে বড়ই ভুল করে ফেলেছে সে। কালোবাবু তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেনই, আগামের হাজার টাকাও ফেরত চেয়েছেন। ফেরত না দিলে যে কী হবে, তা ভাবতেও হাত-পা হিম হয়ে আসে। তাই আজকাল সুধীরের ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ে। খিদে হয় না, ঘুম হয় না, বেঁটে হওয়ার দরুন যে আনন্দটা হত, সেটাও হয় না। লাইনের বন্ধুবান্ধবরা আগে খোঁজখবর নিত, তারাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

এমনকী, কানাই দারোগা পর্যন্ত তাকে থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, "ওরে চোর-পুলিশের সম্পর্কটা তো আজকের নয়, হাজার হাজার বছরের পুরনো সম্পর্ক। চোর ছাড়া যেমন পুলিশের চলে না, তেমনি পুলিশ ছাড়া চোরের মহিমা থাকে না। বুঝলি? সম্পর্কটা অনেকটা বাপ-ব্যাটার মতো। আবহমান কালের ব্যাপার। তাই তোর ভালর জন্যই বলি, বিদ্যেটা একটু ভাল করে ঝালিয়ে নিয়ে তবে কাজে নামিস বাবা! মন্টুরাম তোর নামে একটা ডায়েরি করে রেখেছে বটে, তবে তুই কাঁচা চোর বলে আমি কেস দিচ্ছি না।"

এ কথা শুনে সুধীরের ভারী আবেগ এসে পড়ায় সে হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলল, "আর চুরিটুরি করব না বড়বাবু।"

তাতে কানাই দারোগা ভারী অবাক হয়ে বলল, "চুরি করবি না! চুরি করবি না কেন রে? চুরি না করলে তোরই বা চলবে কী করে,

আমাদেরই বা চলবে কী করে? বলছি কী, হাত মকশো করে নিয়ে কাজে লেগে যা। আর পুলিশের সঙ্গে যে তোর বাপ-ব্যাটার সম্পর্ক, সেটা ভুলিস না। খোরপোশ বাবদ কিছু করে দিয়ে যাস বাবা।"

"যে আজ্ঞে।"

"এখন যা বাবা, আমার বাড়ির কাজের মেয়েটা তিনদিন ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে। এই তিনটে দিন ঘরের ছেলের মতো আমার বাড়ির কাজগুলো করে দে। বেশি কিছু নয় রে, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করবি। কাপড়চোপড় কেচে দিবি আর বাসনগুলো মেজে দিবি। আর ওই সঙ্গে বাগানটাও একটু কুপিয়ে দিস বাবা।"

এটা যে আরও বড় অপমান, সেটাও সুধীর হাড়ে হাড়ে টের পেল। এর চেয়ে জেল খাটলেও সেটা সম্মানের ব্যাপার হত। অপমানে অপমানে সে যেন আরও বেঁটে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেঁটে হওয়ার আনন্দ টের পাচ্ছে না।

চৈতন্যপুরের খালধারে বাঁধানো বটতলায় একটা গামছা পেতে শুয়ে নিজের দুঃখের কথাই ভাবছিল সুধীর গায়েন। ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল। এমন সময় টের পেল, তার শিয়রের কাছে কে যেন এসে সাবধানে বলল, "কালোবাবু নয় তো!" কালোবাবু এমনি ভাবেই হঠাৎ-হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হয়ে যান, কখনও যেন বাতাস থেকে শরীর ধরেন। কখন কোথায় হাজির হবেন, তার ঠিক নেই। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা ওই মূর্তিকে দেখলে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। তাই সুধীর জোর করে চোখ বন্ধ রেখে মটকা মেরে পড়ে রইল।

শিয়রের কাছে বসা লোকটা যেন উসখুস করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, "উঃ! এখানে বড্ড চোর চোর গন্ধ পাচ্ছি।"

কথাটা শুনে সুধীর টক করে উঠে বসল। খিঁচিয়ে উঠে বলল,



“চোর চোর গন্ধ পাচ্ছেন মানে! গন্ধ পেলেই হল? চোরের গায়ে কি আলাদা গন্ধ থাকে নাকি?”

বুড়োসুড়ো লোকটা ধুতির খুঁটে নাক চেপে ছিল। জুলজুল করে সুধীরের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, “তা থাকে বই কী বাপু। চোরের গন্ধ আমি খুব চিনি। একটু চামসে গন্ধ। কাঁচা চামড়া রোদে দিলে যেমনটা হয়। তা বাপু, তুমি কি চোর নাকি?”

সুধীর গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, “না। চুরি ছেড়ে দিয়েছি।”

লোকটা যেন একটু আঁতকে উঠল, তারপর ভারী অবাক হয়ে বলল, “বলো কী? ছেড়ে দিয়েছ?”

“হ্যাঁ। ও কর্ম আমার জন্য নয়।”

“ছেড়ে দিয়েছ, কিন্তু গন্ধ যে একেবারে ম ম করছে হে!”

“মোটেই আমার গায়ে কোনও চামসে গন্ধ নেই। আমি রোজ গায়ে মাটি মেখে চান করি।”

“ও কি আর গায়ের গন্ধ হে! ও হল গুণের গন্ধ, সবাই কি ও গন্ধ টের পায়?”

সুধীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “গুণ-টুন আমার নেই মশাই। আমি ঠিক করেছি, এই বটতলাতেই একটা তেলেভাজার দোকান দেব।”

লোকটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল, “সর্বনাশ! এত ক্ষমতা, এত বুদ্ধি, এত এলেম নিয়ে শেষে তেলেভাজার দোকান! এ যে হাতি দিয়ে হালচাষ! গদা দিয়ে পেরেক পোঁতা! পুকুরে জাহাজ ভাসানো!”

সুধীর একটু ভড়কে গিয়ে বলে, “মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে বলুন তো মশাই! আপনি কি সাঁটে কিছু বলতে চাইছেন?”

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে

হাল-ছাড়া গলায় বলে, "মৃগনাভির কথা শুনেছ তো! কোটিতে গুটিক মেলে। কত লোক মৃগনাভির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সেই হরিণ খুঁজে পাওয়া ভারী কঠিন কাজ। বুঝলে?"

"বুঝলুম মশাই। কিন্তু মৃগনাভিতে আমাদের কী প্রয়োজন?"

"তা ধরো কেন, আমি আজ সেই দুষ্প্রাপ্য মৃগনাভির হরিণই খুঁজে পেয়েছি। চামসে গন্ধ শুনে তুমি রাগ করলে বটে, কিন্তু ওই চামসে গন্ধওলা লোক খুঁজে খুঁজে কত মানুষ যে হয়রান হয়ে যাচ্ছে, তা জানো?"

"কেন মশাই, এত মানুষ থাকতে হঠাৎ চামসে গন্ধওলা লোককেই সবাই খুঁজছে কেন?"

"সেটাই তো লাখ টাকার প্রশ্ন হে। শুধু কি খুঁজছে? টাকার থলি হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পেলেই আগাম ধরিয়ে দিয়ে কাজে লাগিয়ে দেবে। তবে কী জানো, যার ওই গন্ধ আছে, সে নিজেও টের পায় না কিনা। এই যেমন তুমি। এত গুণ নিয়ে ভরদুপুরে বটতলায় গামছা পেতে শুয়ে আছ। একেই বলে প্রতিভার অপচয়। ক্ষমতার অপব্যবহার, বেনারসি পরে বাসন মাজা।"

সুধীর হাঁ হয়ে লোকটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর খানিকটা বাতাস খেয়ে ফেলে বলল, "আপনি কি বলতে চান যে, আমি একজন ভাল চোর?"

লোকটা ঘনঘন ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলে, "না-না, গন্ধওলা চোরকে আমরা ভাল চোর মোটেই বলি না।"

সুধীর ফুঁসে উঠে বলে, "ভালই যদি না হবে, তা হলে এত কথা হচ্ছে কীসের মশাই?"

"শাস্ত্রে গন্ধওলা চোরকে বলে চূড়ামণি চোর। তারা তস্করশ্রেষ্ঠ। তারা হল গে পরস্বাপহরক কুলের রাজা। দশ-বিশ বছরে এরকম

মানুষ একটা-দুটো মাত্র জন্মায়। শুধু ভাল চোর বললে যে তাদের বেজায় অপমান হয় হে!"

কথাটা শুনে সুধীর থম ধরে কিছুক্ষণ বসে রইল। স্বপ্ন দেখছে কি না, তা কিছুক্ষণ বুঝতে পারল না।

লোকটার চোখ এড়িয়ে নিজের বাঁ বগলটা একটু তুলে গন্ধ শোঁকারও একটা চেষ্টা করল সে। কিন্তু তেমন কোনও চামসে গন্ধ আছে বলে মনে হল না তার।

লোকটা ভারী উদাস আর করুণ গলায় বলল, "নিজের গায়ের গন্ধ টের পায় না বলে এমন কত প্রতিভাই যে চর্চার অভাবে মাটি হয়ে গেল, তার হিসেব নেই। যার শ্রেষ্ঠ চোর হয়ে দাপিয়ে বেড়ানোর কথা সে হয়তো দেখা গেল, থানার সেপাই হয়ে টুলে বসে খইনি ডলছে, কিংবা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার হয়ে ছাত্র ঠ্যাঙাচ্ছে, নয়তো বাড়ি বাড়ি লক্ষ্মীপুজো করে গামছায় চালকলা বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরছে কিংবা বটতলায় বসে তোলা উনুনে ভেজাল তেলে ফুলুরি বেগুনি ভাজছে। ভাবলেও মনটা হাহাকারে ভরে যায় হে। বটগাছের বীজ থেকে আসশ্যাওড়া জন্মালে কার না দুঃখ হয় বলো।"

সুধীর উদাস নয়নে দূরের মাঠঘাটের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলল, "না মশাই, অনেক ভেবে দেখেছি, চুরি করা মোটেই ভাল কাজ নয়। ওতে বড্ড পাপ হয়। ও আমি ছেড়েই দিয়েছি।"

লোকটা ভারী মোলায়েম গলায় বলে, "কথাটা আমিও শুনেছি বটে। চুরি করা মহাপাপ। তা এ হল বহু পুরনো কথা। সাহেব আমলের টানাপাখা কি এখন চলে, বলো! না কি আমরা এখনও সেই আগেকার মানুষের মতো কাঁচা মাংস খাই! বন্দুক-পিস্তলের যুগে কেউ কি আজ তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে নামে! অর্থশাস্ত্রটা

পড়ে দ্যাখো বাপু, চুরি করা একরকম সমাজসেবা বই নয়। ধরো না কেন, তুমি একজন পয়সাওলা লোকের কাছ থেকে একশো টাকা চুরি করলে, তারপর সেই একশো টাকা থেকে দু'টাকার মুড়ি-বাতাসা কিনে খেলে, এক টাকার বিড়ি কিনলে, দু' কিলো চাল, এক পো ডাল, এক শিশি তেল, নুন, লঙ্কা, আখের গুড়, কিনলে তো! তাতে মুড়িওলা, বাতাসাওলা, বিড়িওয়ালা, সবজিওয়ালা সবাই কিছু কিছু পেল। এখন দ্যাখো, যার একশো টাকা ছিল সে একটু নামল, আর মুড়িওলা, বাতাসাওয়ালা, বিড়িওয়ালা, সবজিওলারা একটু উঠল। আর এইভাবে অল্প অল্প করে চোরেরা সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনতে সাহায্য করছে কি না তা ভেবে দ্যাখো। মানুষ বিপ্লব করে যা করতে চাইছে, চোরেরা তো সেটাই করছে রে বাপু। প্রাণ হাতে করে, রাত জেগে, পুলিশের কিল-গুঁতো খেয়ে, জেল খেটে তারা যা করছে, একদিন লোকে তার মূল্য বুঝবে আর ধন্যি ধন্যি করবে।"

সুধীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "চোরের যে এত মহিমা, চোর যে আসলে বিপ্লবী, তা মোটেই জানতাম না মশাই।"

লোকটা একটু অবাক হয়ে বলল, "কথাটা কি তোমার ন্যায্য মনে হল না বাপু?"

সুধীর ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলে, "অন্যায্যও নয়। তবে কিনা কথাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা প্যাঁচ আছে। সেইটে ধরতে পারছি না।"

"ওরে বাপু, প্যাঁচ না থাকলে লাট্টু ঘোরে না, প্যাঁচ ছাড়া জিলিপি হয় না, ঘুড়ি কাটে না, লতা গাছ বেয়ে উঠতে পারে না। প্যাঁচ কি ফ্যালনা জিনিস?"

"তা অবিশ্যি ঠিক।"

লোকটা খুশি হয়ে বলল, "এই তো বুঝেছ! বুঝতেই হবে। তুমি

শুধু গন্ধওলা মানুষই নও, তার উপর নাটা। যত নাটা, তত বুদ্ধি। সাইজটাও একেবারে জুতসই। যাকে বলে সোনায় সোহাগা। মাথায় ফুলঝুরির মতো বুদ্ধি, হাতে কেউটের ছোবলের মতো কাজ, পায়ে হরিণের মতো দৌড়। আর চাইবে কী বাপু, ভগবান তো তোমাকে একেবারে বরপুত্র করেই পাঠিয়েছেন!"

সুধীরের কেন যেন একটু ঠ্যাং দোলাতে ইচ্ছে যাচ্ছিল, তাই সে কিছুক্ষণ নীরবে ঠ্যাং দোলাল।

সাদা দাড়ি-গোঁফ আর সাদা বাবরি চুলের বুড়ো লোকটা তাকে কিছুক্ষণ জুলজুল করে দেখে জামার ভিতরের পকেট থেকে সাবধানে কিছু টাকা বের করে বলল, "দ্যাখো বাপু, গুণী মানুষের কদর করতে পারি, তেমন সাধ্যি আমার নেই। তবু এই হাজার দেড়েক টাকা রাখো।"

সুধীর ভারী অবাক হয়ে মাথা নিচু করে লাজুক গলায় বলল, "আহা, টাকা কীসের জন্য? আমি তো কিছু করিনি এখনও।"

"তাতে কী? তোমার সময়টা যে ভাল যাচ্ছে না, তা তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি।"

সুধীর গদগদ হয়ে বলে, "বড় উপকার করলেন মশাই। অনেক ধারকর্জ হয়ে আছে। সেগুলো শোধ হয়ে যাবে।"

"আর একটু কথা ছিল বাপু। কানাঘুষো শুনেছি, দশ-বারো বছর আগে তোমার যখন ছোকরা বয়স, সে সময় তুমি নাকি জাদুকর মদন তপাদারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলে?"

সুধীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "অ্যাসিস্ট্যান্ট বললে বাড়াবাড়ি হবে। তবে আমি তাঁর তল্পিতল্পা বইতাম বটে। ইচ্ছে ছিল, ম্যাজিক শিখে আমিও খেলা দেখিয়ে বেড়াব।"

"তা শিখলে?"

"শিখেছিলাম। তবে তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বুঝলাম যে, ম্যাজিকের

তেমন বাজার নেই। মদনবাবু তেমন বড় ম্যাজিশিয়ান তো ছিলেন না। আগে সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখাতেন। অনেক টাকা মাইনে ছিল। পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে যাওয়ায় সার্কাসের চাকরি যায়। তখন পেটের দায়ে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতেন।"

"তা বাপু, তার ম্যাজিকের বাক্সখানা তো তুমি নিশ্চয়ই মেলা নাড়া-ঘাঁটা করেছ? তাতে কী ছিল মনে আছে?"

"তা থাকবে না কেন? আমিই তো গুছিয়ে রাখতুম। কিন্তু বিশেষ কিছুই ছিল না মশাই। গোটা আষ্টেক থ্রোয়িং নাইফ, কয়েকটা লোহার বল, কয়েক প্যাকেট তাস, আর ম্যাজিকের চোঙা, খেলনা পিস্তল, মন্ত্রপড়া রুমাল, এইসব আর কী!"

"আর কিছু?"

"একটা ধুকধুকি ছিল, মনে আছে। মদনবাবু সেটায় হাত দিতে বারণ করতেন। দস্তার একটা চৌকোমতো কাচ, তাতে একটা পালোয়ানের ছবি খোদাই করা। আমি অনেক নেড়ে-ঘেঁটে দেখেছি মশাই, তা থেকে দৈত্য-দানো কিছুই বেরোয়নি।"

"মদনবাবু যে রাতে নিরুদ্দেশ হন, সে রাতে তুমি তার কাছে ছিলে?"

ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুধীর বলে, "ছিলুম মশাই। এক বন্ধুর বাড়িতে তার বোনের বিয়ের ভোজ খেয়ে অনেক রাতে এসে মদনবাবুর পায়ের কাছে বস্তা পেতে শুয়েছিলুম।"

"তারপর?"

"তারপর শুনবেন? সেটা আমার পক্ষে বড় লজ্জার কথা। তবে অনেক দিন হয়ে গিয়েছে, এখন বলতে লজ্জা নেই। তার উপর এত টাকা দিলেন, তারও তো একটা প্রতিদান আছে! সেই রাতে মন্টুরামের বাড়িতে আমি চুরি করে পালিয়ে গিয়েছিলাম।"

"বটে!"

"হ্যাঁ! পলকা দরজা দেখে লোভ সামলাতে পারিনি। আমার ভিতরকার ঘুমন্ত চোরটা জেগে উঠেছিল। কিছু বাসনকোসন, একটা ঘড়া, সাইকেল আর ঘড়ি। পরে শুনেছি মন্টুরাম আর তার বাড়ির লোকেরা চোর বলে মদনবাবুকে খুব অপমান করে তাড়িয়ে দেয়।"

"তোমার সঙ্গে মদন তপাদারের আর দেখা হয়নি?"

"আজ্ঞে না। খুব মনস্তাপ হয়েছিল আমার। গাঁয়ে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে আমি অনেক খুঁজে দেখেছি। মনে হয় ম্যাজিকের বাক্সটা হাতছাড়া হওয়ায় মদনবাবু না খেয়েই মারা গিয়েছেন। সেইজন্য আমি অনেকদিন কান্নাকাটি করেছি। মদনবাবু ভালই জানতেন চুরিটা আমিই করেছিলাম, তবু মন্টুরামের কাছে আমার নাম বলেননি।"

"বাক্সটা দেখলে চিনতে পারবে?"

"সে কী কথা! ও বাক্স মাথায় করে করে মদনবাবুর সঙ্গে কি কম ঘুরেছি মশাই! সেই ছেঁড়াখোঁড়া বাক্সটার যে এখন এত দাম হবে, কে জানত! ভয়ংকর-ভয়ংকর সব লোকেরা বাক্সটার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে।"

"তারা কারা জানো?"

"কালোবাবু আর ফুটু সর্দার। দু'জনেই সাংঘাতিক লোক মশাই। কিন্তু ওই বাক্সের মধ্যে কী এমন আছে, তাই তো ভেবে পাই না।"

"হুঁ, চিন্তার কথাই হে।"

"আজ্ঞে, খুবই চিন্তার কথা। তা মশাই, আপনিও কি ওই বাক্সের একজন উমেদার নাকি?"

বুড়ো মানুষটি দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটু হেসে বলল, "না হে বাপু, এই একটু খোঁজখবর নিচ্ছিলাম আর কী! তবে

আমি যতদূর জানি, ওই বাক্সের একজন ওয়ারিশান আছে।”

“বুঝেছি, কিন্তু ওয়ারিশান ও বাক্স বেচলেও তো তাতে বিশেষ কিছু পাবে না। কেন এত দাবিদার জুটছে, তা কি বলতে পারেন? মনে হচ্ছে আপনিও বাক্সটার খোঁজেই এসেছেন।”

“তোমার খোঁজেও। তুমি বেশ ভাল লোক।”

“ওকথা কবেন না কর্তা, শুনলে পাপ হয়।”



লোকে মন্টুরামের টাকাপয়সা দ্যাখে, জমিজিরেত দ্যাখে, মন্টুরামের গাড়ি বাড়ি দ্যাখে। দ্যাখে আর হিংসে করে, আর হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়। তারা পাঁচজনের কাছে মন্টুরামের কুচ্ছো গেয়ে বেড়ায়। মন্টুরামের কোনও বিপদআপদ ঘটলে, মন্টুরাম কোনও ফ্যাসাদে পড়লে লোকে ভারী খুশি হয়। এ সবই মন্টুরাম হাড়ে হাড়ে জানেন। কিন্তু লোকে মন্টুরামের দুঃখ বুঝতে চায় না। মন্টুরাম যে কত দুঃখী, তাঁর ধন-দৌলতের তলা দিয়ে দুঃখের ফল্গু নদী বয়ে যাচ্ছে, এ তো আর লোকের চোখে পড়ে না। বুকের দুঃখ বুকে চেপে রেখেই মন্টুরাম নীরবে বিষয়কর্ম করে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে এক-আধটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বটে, কিন্তু কর্তব্যকর্মে তিনি সর্বদাই অটল।

পুরনো দুঃখগুলোর সঙ্গে মন্টুরামের একরকম ভাবসাব হয়েই গিয়েছে। দুঃখ নিয়েই যখন থাকতে হবে, দুঃখের সঙ্গেই যখন বসবাস, তখন তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে আর লাভ কী? দুঃখ বলতে তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছে চৈতন্যপুরের পুরনো রাজবাড়িটা কিনে সেখানে একটা প্রাসাদ বানানো। রাজবাড়িতে থাকার কেতাই আলাদা। তা সেটা হয়ে উঠছে না। কারণ, বুড়ো রাজা হরিশ্চন্দ্র এখনও বেঁচেবর্তে আছেন। আর-একটা দুঃখ হচ্ছে তাঁর বউ হরিমতী। হরিমতীর বড় দানধ্যানের হাত। ভিখিরি আসুক, সাধুসন্নিসি আসুক, চাঁদা পার্টি আসুক, হরিমতী কাউকে ফেরান না। এমনকী, প্রায়

প্রতিদিনই দু'-চারজন গরিব দুঃখীকে পাত পেড়ে বসে খাওয়ান। অনেক চেষ্টা করেও এই অপচয় ঠেকাতে পারছেন না মন্টুরাম। তাঁর তিন নম্বর দুঃখ হল, ইংরেজি। কিছুদিন আগে গাঁয়ের পুরনো মন্দিরের ফোটো তুলতে একজন রাঙামুলো টকটকে সাহেব এসে হাজির। কিন্তু কেউই তার কথা বুঝতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে থাকে। তখন চৈতন্যপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের হেডস্যার অখিলবাবু এগিয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে ফটাফট ইংরেজি বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। ওইরকম ইংরেজি বলতে না পারার দুঃখে ভারী কাতর হয়ে রয়েছেন মন্টুরাম। তা ইংরেজি শেখার জন্য অখিলবাবুকে মাইনে দিয়ে বহালও করা আছে। কিন্তু বিষয়কর্মে কোনও ফাঁক নেই বলে ফুরসতই হয়ে উঠল না আজ পর্যন্ত মন্টুরামের। এসব ছাড়াও হিসেব করতে বসলে দুঃখের ঝুড়ি ভরে যাবে।

কিন্তু ইদানীং যে নতুন দুঃখটা এসে হাজির হয়েছে, সেটা হল দু' নম্বর মন্টুরাম। আর এই দু'নম্বর মন্টুরামের সঙ্গে মন্টুরামের একেবারেই বনিবনা হচ্ছে না। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই দু'নম্বর মন্টুরাম যখন-তখন, যেখানে-সেখানে ফস করে উদয় হয়ে মন্টুরামকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছেন।

এই তো সেদিন তিনশো টাকা কিলো দরে সরেস ইলিশ মাছ এনেছিলেন মন্টুরাম। রান্নাটাও হয়েছিল ভাল। সবে ইলিশের বাটি কাছে টেনেছেন, এমন সময় দু'নম্বর মন্টুরাম আড়াল থেকে বলে উঠলেন, "মন্টুরাম, ইলিশ মাছ খাচ্ছ নাকি?"

মন্টুরাম হুংকার দিয়ে বললেন, "খাচ্ছিই তো! কার বাবার কী?"

"সে তো বটেই। একটু আগে নোনাপাড়ায় দেখে এলাম ষষ্ঠীর বিধবা মা পান্তাভাত নিয়ে বসেছে, সঙ্গে নুন ছাড়া কিছু নেই। শিকেয় ঝোলানো মেটে হাঁড়িতে এক ছড়া তেঁতুল খুঁজছিল। না

পেয়ে কপাল চাপড়ে নুন দিয়েই সাঁটছে। অবশ্য তাতে তোমার কীই বা এল-গেল মন্টুরাম। তুমি খাও।”

খেলেন মন্টুরাম। তবে ইলিশ মাছটা গঙ্গামাটির মতো লাগছিল।

এই তো সেদিন নগেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে বিষয়সম্পত্তি ঘটিত মামলায় হাইকোর্টের রায় বেরোল। মন্টুরাম জিতে গিয়েছেন। এখন নগেন বাঁড়ুজ্যের বসতবাটিসহ গোটা সম্পত্তিই মন্টুরামের দখলে। আনন্দের চোটে মন্টুরাম নন্দকিশোরের দোকান থেকে তার বিখ্যাত ক্ষীরকদম এক হাঁড়ি কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ কোথা থেকে দু'নম্বর মন্টুরাম গাড়ির পিছনের সিটে যেন ঠিক তাঁর পাশেই বসে খুব করুণ গলায় বললেন, “মন্টুরাম, মনে পড়ে?”

মন্টুরাম খেঁকিয়ে উঠে বললেন, “কী মনে পড়বে?”

“সেই যে যখন ছোটটি ছিলে, তখন প্রতি বেস্পতিবার গিয়ে প্রসাদের লোভে নগেনদের বাড়িতে গুটিগুটি হাজির হতে! আর নগেনের মা কলাপাতায় নাড়ু, মোয়া, বাতাসা আর ফলের টুকরো দিতেন হে! মনে নেই?”

মন্টুরাম ধমক দিয়ে বললেন, “তাতে কী হল? মাথা বিকিয়ে গিয়েছে নাকি?”

“মন্টুরাম, বলছিলাম কী, মামলায় হেরে সর্বস্ব খুইয়ে আজ রাতে যদি নগেন বাঁড়ুজ্যে গলায় দড়ি দেয়, তা হলে ওই ক্ষীরকদম তোমার গলা দিয়ে নামবে তো? ভাল করে ভেবে দ্যাখো বাপু। ক্ষীরকদম ভাল জিনিস বটে, কিন্তু ভাল জিনিস তখনই ভাল, যখন তার আগু-পিছুটাও ভাল হয়।”

মন্টুরাম হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, “তা হলে কী করতে হবে?”

“অন্তত বসতবাড়িটা ছেড়ে দাও। নগেনের দাঁড়ানোর জায়গা নেই।”

মন্টুরাম তেড়ে উঠে বললেন, “আর আমার অত টাকা!”

দু’নম্বর মন্টুরাম বললেন, “লোকে যে বলে তোমার টাঁকশাল আছে, সে তো আর এমনি নয়। নগেনের তো ঢেঁকিশালটাও নেই।”

মন্টুরাম মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, “না হে দু’নম্বর মন্টুরাম, এভাবে বিষয়কর্ম চলে না। এরকম চলতে থাকলে যে আমি পথে বসব।”

কিন্তু দু’নম্বর মন্টুরাম একা নয়। তার সঙ্গে হরিমতীরও যোগসাজশ আছে। রাত্রিবেলা হরিমতীও কাঁদতে বসলেন। বললেন, “ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, তাদেরও তো ভালমন্দ আছে। বামুন মানুষকে ভিটেছাড়া করলে কি আমাদের ভাল হবে ভেবেছ! আমি অতশত জানি না বাপু, তুমি ওদের ভিটেমাটি ফিরিয়ে দাও।”

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দাঁতে দাঁত চেপে তাই করতে হল মন্টুরামকে। দু’নম্বর মন্টুরামকে সামনে পেলে যেন চিবিয়ে খান।

তা এইভাবেই মন্টুরামের সঙ্গে দু’নম্বর মন্টুরামের শত্রুতা বেড়েই চলেছে।

মন্টুরামের বড় ছেলে নন্দরামের বিয়ে ঠিক হল সেদিন। কনেপক্ষ এসেছিল দানসামগ্রী নিয়ে কথা কইতে। এক লাখ টাকা নগদ আর পঞ্চাশ ভরি সোনা। সঙ্গে টিভি, ফ্রিজ, একখানা মোটরবাইক ইত্যাদি। পাটিপত্র সইসাবুদ হতে যাচ্ছে, ঠিক এই সময় দু’নম্বর মন্টুরামের গলা শুনতে পেলেন মন্টুরাম। কানের কাছে ফিসফিস। দু’নম্বর বললেন, “সবই তো হল, কিন্তু একটাই মুশকিল হে মন্টুরাম।”

মন্টুরাম গম্ভীর হয়ে বললেন, “কীসের মুশকিল?”

“নতুন বউ এসে যখন তোমাকে পেন্নাম করবে, তখন কিন্তু মনে মনে সে তোমার কানও মলে দেবে। যতবার তোমার মুখের দিকে চাইবে, ততবার মনে মনে তোমার মুখে থুতু দিতে ইচ্ছে যাবে তার।”

"কান মলবে! থুথু দেবে! বলো কী?"

"শুধু কি তাই! যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন ঘেন্না করবে তোমাকে।"

"অ্যাঁ!"

"ভেবে দ্যাখো মন্টুরাম। এক লাখ টাকা, পঞ্চাশ ভরি সোনা আদায় করে সুখ হবে তো? টাকায় মেলা জিনিস কেনা যায় বটে, কিন্তু ছেদ্দা-ভক্তি যে দোকানে বিকোয় না হে। বিকিকিনির বাজারে ও জিনিস পাবে না। ভেবে দ্যাখো।"

পারলে দু'নম্বর মন্টুরামের মুন্ডুটা ছিঁড়েই ফেলতেন মন্টুরাম। কিন্তু সে উপায় নেই। হাত নিশপিশ করে, দাঁত কড়মড় করে, কিন্তু মন্টুরামের দু' নম্বর মন্টুরামকে ছোঁয়ারও উপায় নেই।

রাত দুটো। চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ। দূরে শেয়ালের ডাক। ঝিঁঝির শব্দ। মন্টুরাম নিঃশব্দে উঠে তিনতলায় তাঁর স্ট্রং রুমে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর বড় সিন্দুকটা খুলে জাদুকর মদন তপাদারের ছেঁড়াখোঁড়া সুটকেসটা বের করলেন। তারপর ডালাটা খুলে খুব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। রোজই করেন। একজন গেঁয়ো আর গরিব বাজিকরের যা যা থাকে, সে সবই রয়েছে বাক্সটায়। এমন কোনও আহামরি বস্তু নেই, যার জন্য বাড়িতে চোর এলে হানা দেবে কিংবা ষণ্ডাগুন্ডারা হন্যে হয়ে উঠবে। মন্টুরাম অবশ্য ঘাবড়াননি। তাঁর লোকবল দারুণ। সুধীর গায়েন হানা দেওয়ার পর তিনি বাড়ি পাহারা দেওয়ার আরও মজবুত ব্যবস্থা করেছেন। নতুন পাইক রাখা হয়েছে। কানাই দারোগা দু'জন সেপাই মোতায়েন রেখেছেন। কিন্তু এত বন্দোবস্ত করা হল যে কারণে, সেই বাক্সের রহস্যই তো বুঝতে পারছেন না মন্টুরাম।

ঠিক এই সময় ঘাড়ে শ্বাস ফেলার মতো কাছ থেকে দু'নম্বর

মন্টুরাম বলে উঠলেন, "আছে হে আছে। দেখার চোখ থাকলে ঠিকই দেখতে পেতে।"

মন্টুরাম ভারী বিরক্ত হয়ে বললেন, "এতই যদি জানো, তবে বলে দিলেই তো হয়। তোমাকে দিয়ে তো আজ পর্যন্ত কোনও উপকার হল না। কাজে বাগড়া দিতে এসে হাজির হও।"

"বলি সব কিছু খুঁটিয়ে দেখেছ তো?"

"কিছুই বাকি রাখিনি হে। ম্যাজিকের সামগ্রী ছাড়া আর আছে একটা ধুকধুকি। তা সেটা আলাদিনের পিদিম কি না জানি না। নেড়ে-ঘেঁটে, ঘষে-মেজে দেখেছি বাপু, কোনও মহিমা প্রকাশ হয়নি। আর ওই উপরের পকেটে একটা ছোট ছেলের ফোটো আছে। পিছনে নাম লেখা হিরু। তা এই হিরুটা কে অবিশ্যি জানা নেই।"

"হুঁ। বিশ বছর আগেকার ফোটো। হিরুর চোখদুটো দেখেছ? খুব জ্বলজ্বলে কিন্তু। মনে হয় ভবিষ্যতে বেশ কঠিন মানুষ হবে।"

"ওরে বাপু, হিরুর খবরে আমাদের দরকার কী?"

"না, এই বলছিলাম আর কী। হিরু বেঁচে থাকলে এখন তার বয়স সাতাশ-আঠাশ হবে।"

"তা হোক না। কাজের কথায় এসো তো বাপু। এই বাক্সে কি কোনও গুপ্ত পকেট বা ফাঁকফোকর আছে? তাতে কি গুপ্তধনের নিশানা পাওয়া যাবে?"

দু'নম্বর মন্টুরাম হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে বলেন, "তুমি আর গুপ্তধন নিয়ে কী করবে বলো তো মন্টুরাম? তোমার যা আছে তাই তো সাতপুরুষে খেয়ে ফুরোতে পারবে না।"

মন্টুরাম ফুঁসে উঠে বললেন, "বাজে বোকো না তো! টাকা কি কারও বেশি হয় নাকি? আরও টাকা হলে আরও কত কী করা যায়।"

রাত আড়াইটে নাগাদ রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘুম ভেঙেছে। আর ঘুম ভাঙলেই যত উদ্ভুটে ঘটনা ঘটতে থাকে। এই তো সেদিন ঘুম ভেঙে দ্যাখেন, রসময় পণ্ডিতমশাই বসে আছেন। বললেন, "ওরে হরি, আজ তোকে সমাস চ্যাপটারের পড়া ধরব। বল তো 'ভর্তৃহরি' কী সমাস!" হরিশ্চন্দ্র মহা ফাঁপরে পড়ে আমতা আমতা করছিলেন। এমন সময় ঝড়ের মতো তাঁর তিন পিসি এসে হাজির। কানা পিসি বলল, "ও পণ্ডিত, ওরকম দুধের বাছাকে অমন শক্ত শক্ত প্রশ্ন করতে আছে? সোজা সোজা প্রশ্ন করো তো বাপু। আস্তে আস্তে শিখবে।"

রসময় ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "প্রশ্রয় দিয়ে-দিয়েই তো আপনারা ছেলেপিলেগুলোকে নষ্ট করেন," বলে ভারী রাগ করে উঠে গেলেন রসময়।

আর একদিন অম্বুরি তামাকের গন্ধে উঠে বসে হরিশ্চন্দ্র দ্যাখেন, তাঁর ঠাকুরদা মহিমচন্দ্র গদিআঁটা চেয়ারটায় বসে গড়গড়া টানছেন। হরিশ্চন্দ্র তাড়াতাড়ি কোমরের ব্যথা, হাঁটুর কটকটি উপেক্ষা করে প্রণাম করে দাঁড়াতেই মহিমচন্দ্র বজ্রনির্ঘোষে বললেন, "ওরে হরি, এসব কী দেখছি? হাতিশালে হাতি নেই, ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই, গোশালা ফাঁকা। দাসদাসীগুলো সব উবে গেল নাকি? প্রাসাদের চুড়ো হেলে পড়েছে, পুকুরে ভরতি কচুরিপানা!"

হরিশ্চন্দ্র ভয়ে ভয়ে বললেন, "আজ্ঞে, খাজনাটা আদায় হলেই সব হয়ে যাবে।"

"আরও একটা কথা শুনছি। কোনও বেয়াদব নাকি তোর কাছে রাজবাড়ি কিনে নেবে বলে প্রস্তাব পাঠিয়েছে।"

"আজ্ঞে মহারাজ। মন্টুরাম সিংহ।"

"তার এত সাহস?"

"দশ লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল।"

মহিমচন্দ্র চোখ কপালে তুলে বললেন, "দশ লাখ! সে তো অনেক টাকা!"

"আজ্ঞে না। সেই আমলের সঙ্গে তুলনা করলে এখনকার দশ লাখ তখনকার হাজার পাঁচ-ছয়ের বেশি হবে না।"

"পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে লোকটাকে বেঁধে এনে বিছুটি দিতে পারিস না?"

হরিশ্চন্দ্র ভালই জানেন মন্টুরামের অনেক টাকা, মেলা পাইক-বরকন্দাজ। তাঁকে বেঁধে আনার সাধ্যি হরিশ্চন্দ্রের নেই। তাই মিনমিন করে বললেন, "আজ্ঞে, সে আর বেশি কথা কী! তবে কিনা পুকুরধারের বিছুটি গাছগুলো লোপাট হয়েছে। ইতুপুর থেকে বিছুটি আনিয়ে তবে...।"

"হ্যাঁ, বেশ করে আগাপাশতলা ঝেড়ে দিবি।"

হরিশ্চন্দ্র জানেন যে, তিনি ভুলভাল দেখেন, ভুলভাল শোনেন, ভুলভাল বোঝেন এবং ভুলভাল বলেন। কিন্তু সবটাই ভুল কি না সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। এই পরশু রাত্তিরে তিন পিসি এসে হাজির। কুঁজো পিসি বলল, "হ্যাঁরে হরি, তোর জিব কি অসাড়? আর স্বাদসোয়াদ টের পাস না? রোজ যে দুধটুকু খাস, আমি আজ তার এক ফোঁটা জিবে ঠেকিয়ে দেখলুম, ও তো পিটুলিগোলা! গয়লাটাকে নাগরা জুতো দিয়ে ঘা কতক দিতে পারিস না?"

হরিশ্চন্দ্রের নাগরা জুতোই নেই। হাতের জোরই নেই। চুপ করে রইলেন।

তখন হঠাৎ কানা পিসি দুটো গিনি তাঁর বিছানায় ছুড়ে দিয়ে বললেন, "তোর অবস্থাটা ভাল যাচ্ছে না জানি। তা ওটা ভাঙিয়ে একটু ভাল-মন্দ খা তো বাছা।"

খোঁড়া পিসি বলল, "দেখিস বাবা, লোভে পড়ে আবার নাদু মালাকারের কাছে আমাদের বেচে-টেচে দিসনি যেন।"

হরিশ্চন্দ্র শশব্যস্তে বললেন, "না পিসিগণ, নাদুকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।"

কুঁজো পিসি বলল, "তাড়িয়ে তো দিয়েছিস বাছা, কিন্তু সে তো প্রাসাদের এখানে-সেখানে এখনও হাঁড়ি নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।"

ব্যাপারটা যদি স্বপ্নই হবে, তা হলে সকালে ঘুম ভেঙে হরিশ্চন্দ্র সত্যি সত্যিই বিছানায় দুটো চকচকে গিনি পেতেন না। রাজবাড়ির পুরনো স্যাকরা নবকৃষ্ণ এসে কষ্টিপাথরে ঘষে বলল, "নাঃ, সোনাটা বড্ড ভাল। ওজনও কম নয়।"

গতকালই বেশ কয়েক হাজার টাকা পেয়ে হরিশ্চন্দ্রের মনটা আবার আশায়-আশায় আছে। পিসিমাগণ হয়তো সত্যি সত্যিই তাঁদের লুকনো সোনাদানা একটু-একটু করে বের করবেন।

আজ রাতে ঘুম ভেঙে হরিশ্চন্দ্র দেখলেন, ট্রাপিজের সেই খেলোয়াড়টি আজ একটা ঝাড়বাতির ডাঁটিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। মুখটা চিন্তিত।

হরিশ্চন্দ্র গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "বাপু হে, আজ যে একটু মনমরা দেখছি।"

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তা একটু চিন্তায় আছি বটে মহারাজ।"

"তা ভাল। চিন্তা বহাল থাকলে আমার বুকের উপর দিয়ে তোমার ওই প্রাণঘাতী লাফঝাঁপগুলো অন্তত বন্ধ থাকবে। তা বাপু, তোমার সমস্যাটা কীসের?"

"আচ্ছা রাজামশাই, আপনি কি তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর নাম জানেন?"

"রক্ষে করো বাপু, কোটি দূরে থাক, আমি তেত্রিশজনেরও নাম বলতে পারব না।"

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, "সেইটেই হয়েছে মুশকিল। কেউই পারে না।"

"কেন বাপু, দেবদেবী নিয়ে বখেড়া কীসের?"

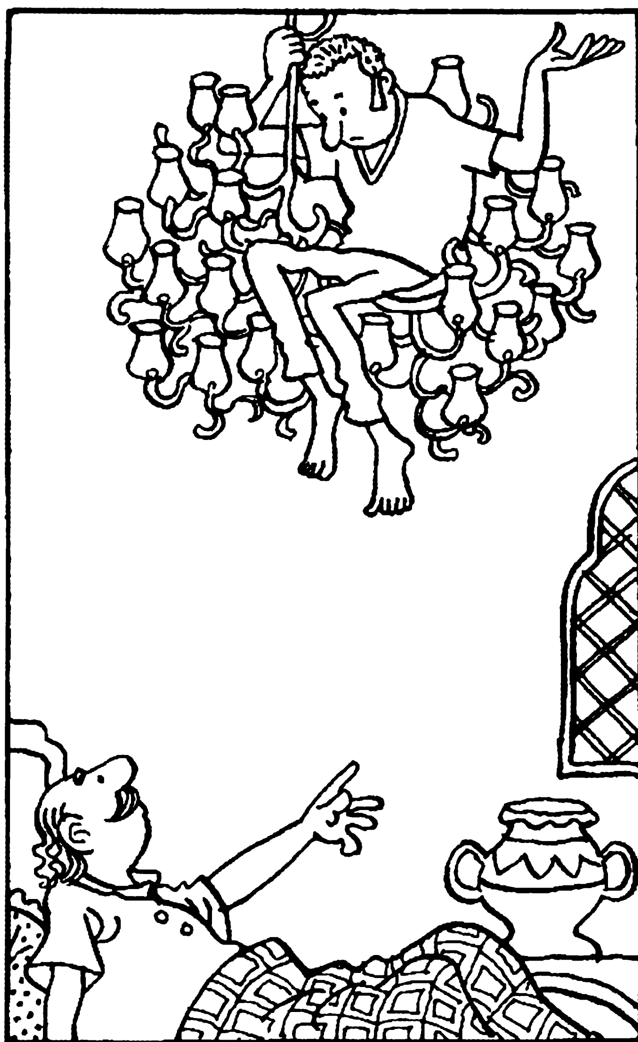
"আচ্ছা, অপদেবতাদের কথা কিছু জানা আছে রাজামশাই?"

"না হে, অপদেবতা আছে বলে শুনেছি বটে, কিন্তু তারা যে কারা, তা জানা নেই। রাজপুরোহিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করা যেত, কিন্তু তাঁর এখন একশো তিন বছর বয়স চলছে। সব কথা মনে করতে পারেন না। আমার মতোই ভুল দ্যাখেন, ভুল শোনেন, ভুল বোঝেন আর ভুল বলেন। তা এইসব উচ্চকোটির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী তোমার?"

লোকটা করুণ মুখে হরিশ্চন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, "বড়ই দরকার পড়েছে রাজামশাই। সবটা না বললে বুঝতে পারবেন না।"

হরিশ্চন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "বাপু হে, আগে তো এ বাড়িতে গল্প শোনানোর জন্য মাইনে করা লোক ছিল। তা সেসব দিন কবেই গত হয়েছে। শুনেছি, তারা এমন সব গল্প বলত যে, তা শুনে রাজারাজড়ারা নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। তা আজ তোমার গল্পটাই শুনি, দেখি ঘুম আসে কি না।"

লোকটা বলল, "আমি যখন পেটের দায়ে গাঁয়ে-গঞ্জে হাটে-বাজারে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতাম, তখন ফুলপুকুরের বিখ্যাত শিবরাত্রির মেলায় খেলা দেখিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। সন্ধে হয়ে আসছিল। বিদ্যেধরীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ সামনে ঘাসের উপর কী একটা জিনিস চকচক করছে দেখে কুড়িয়ে নিলাম। দেখি একটা আয়না। গাঁয়ের হাটে-বাজারে যেমন কাঠের ঢাকনাওয়ালা সস্তা আয়না বিক্রি হয়, তেমনি। আয়নার সঙ্গে একটা লোহার সরু চেনে বাঁধা ধুকধুকিও পড়ে ছিল। তাতে এক পালোয়ানের ছবি খোদাই করা। একবার ভাবলাম, কার না কার



জিনিস, ফেলে রেখেই যাই। তারপর ভাবলাম, পড়ে-পাওয়া জিনিস, থাক ঝোলার মধ্যে। তারপর আর দ্রব্য দুটোর কথা মনেই ছিল না। একদিন ঝোলা ঘাঁটতে গিয়ে আয়না আর ধুকধুকিটা বেরিয়ে পড়ল। আয়নাটা বেশ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলাম, ঢাকনাওলা সস্তা আয়নাই বটে, কিন্তু কাচটা বেশ ভাল জাতের। কোনও ঢেউ বা ঢাল নেই। আর ধুকধুকিটা দেখে ভাবলাম, কে জানে বাপু ধুকধুকি তো আসলে কবচ। এতে হয়তো আমার কপাল ফিরে যেতেও পারে। এই ভেবে ধুকধুকিটা গলায় পরে ফেললাম। আর তার পরেই ঘটনাটা ঘটল।"

হরিশ্চন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "কী ঘটল হে?"

"ধুকধুকিটা গলায় পরে আয়নায় তাকাতেই আঁতকে উঠে দেখি, তাতে আমার মুখের বদলে অন্য একটা মুখ ফুটে উঠেছে। কটা রঙের দাড়ি-গোঁফ, বড় বড় গোল গোল রাগী চোখ, ঘন জোড়া ভ্রু, মাথায় লোহার টুপি, পরনে সোনালি রঙের পোশাক। ভয়ের চোটে আমার হাত থেকে আয়নাটা মেঝেয় পড়ে গেল। কিন্তু ভাঙল না। প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেও চোখের ভুল ভেবে আয়নাটা তুলতেই আবার সেই মুখ। আর আশ্চর্যের বিষয়, আয়নার লোকটা আমাকে কী যেন বলছিল।"

হরিশ্চন্দ্র অবাক হয়ে বলেন, "বলো কী! তা কী বলছিল?"

"জীবনে ওরকম ভাষা শুনিনি। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি বা সংস্কৃত নয়। একেবারে অচেনা ভাষা। এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না। ভূত বলে মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু ভূতেরও তো কিছু নিয়মকানুন আছে। উদয় হতে তাদের আয়নার দরকার হয় না। একটা মজা হল, ধুকধুকিটা গলা থেকে খুলে ফেললে আয়নার লোকটা উধাও হত। তখন আয়নাটা একদম সাধারণ আয়না হয়ে যেত।"

"তা তুমি করলেটা কী?"

"আয়নার লোকটা দেবদেবীর কেউ কি না, না কি অপদেবতা, আমাকে কী-ই বা বলতে চাইছে, তা বুঝবার জন্য আমি প্রতিদিনই আয়নার লোকটার সঙ্গে আমার ভাষায় কথা বলতাম। লোকটা আমার কথা বুঝবার চেষ্টাও করত। কিন্তু বুঝতে পারত না। একদিন রাতে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, প্রচণ্ড বজ্রপাত। হঠাৎ আয়নার লোকটা একটা ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'রোবোশ! রোবোশ!' ব্যস, হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি সব থেমে গেল। কাণ্ড দেখে তো আমি অবাক। সেদিন টের পেলাম, আয়নার মানুষটা সোজা লোক নয়। অনেক ক্ষমতা।"

"দাঁড়াও বাপু, রোবোশ কথাটা টুকে রাখি। কাজে লাগতে পারে।"

লোকটা হেসে বলল, "সে গুড়ে বালি। আমি চেষ্টা করে দেখেছি মহারাজ, কাজ হয় না। ময়নাগড়ে এক বাড়িতে একবার রাতে আমাকে তাদের লকড়িঘরে শুতে দিয়েছিল। মেটে ঘর, ডাঁই করা কাঠকুটো আর বাজে জিনিস। রাতে দেখি, একটা কেউটে সাপ তার দশ-বারোটা ছানাপোনা নিয়ে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে। তখনও আয়না থেকে ওই লোকটা হঠাৎ চাপা গলায় বলেছিল, 'পিরো! পিরো!' সঙ্গে সঙ্গে সাপগুলো পড়ি কি মরি করে পালিয়ে গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ল।'

"এ কথাটাও লিখতে বারণ করছ কি?"

"লিখতে পারেন, তবে কাজ হবে না।"

"ওই রোবোশ বা পিরো ওসব কি মন্তর-তন্তর নাকি?"

"তা কে জানে মহারাজ। শুধু জানি, মন্তর হলেও ও মন্তর আমাদের জন্য নয়।"

হরিশ্চন্দ্র হতাশ হয়ে বললেন, "তা হলেই তো মুশকিল।"

"তবে লোকটার সঙ্গে ভাবসাব করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি।

মনে হয়, মাস দুয়েকের চেষ্টায় একটু-একটু যেন ভাবসাব হয়ে উঠছিল। সেই সময়ে আমি একটা ভুল করে ফেলেছিলাম মহারাজ। সোনার গাঁয়ে একটা আড্ডায় কিছু লোক আমার ম্যাজিক নিয়ে খুব ঠাট্টা-তামাশা করছিল। তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য সেদিন আমি ভারী মাথা গরম করে তাদের আয়নাটা দেখাই। দেখে তারা ভড়কে গেল ঠিকই। কিন্তু গুপ্ত রহস্যটা গেল ফাঁস হয়ে। আর লোকগুলোও সেই থেকে আমার পিছনে লাগল। কেউ টাকা সাধল, কেউ ভয় দেখাতে লাগল, আয়নার লোকটাও ভ্রু কুঁচকে আমাকে কীসব যেন বলেছিল। নিশ্চয়ই ভাল কথা নয়।"

"তারপর কী হল?"

"তারপর থেকে আমি একরকম ফেরার হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আজ এখানে, কাল সেখানে। আয়নার লোকটা তখন আমাকে প্রায়ই বলত, টিকিটাক, টিকিটাক।"

হরিশ্চন্দ্র সাগ্রহে বললেন, "ওর মানে কি 'টিকে থাক' নাকি?"

"কে জানে মহারাজ, তাও হতে পারে। তবে টিকে আর থাকতে পারলাম কই বলুন!"

"কেন হে বাপু? কী হল?"

"ঘুরতে ঘুরতে চৈতন্যপুরে হাজির হয়েছিলাম মহারাজ। ঠিক করে রেখেছিলাম, একটা সুবিধেমতো জায়গা পেলে আয়নাটা লুকিয়ে রাখব। তা আপনার এই রাজবাড়িটা দেখে মনে হল, এমন ভাল জায়গা আর পাওয়া যাবে না। মেলা গুপ্তঘর আর কুঠুরি, কুলুঙ্গি, তাক, পুরনো বাক্সপ্যাঁটরার অভাব নেই। তাই সন্ধের মুখে চুপিসারে ঢুকে আয়নাটা কুলুঙ্গিতে হাবিজাবি জিনিসের পিছনে গুঁজে রেখে দিলাম। ধুকধুকিটা আমার কাছে রাখলাম। আয়নাটা কেউ খুঁজে পেলেও ধুকধুকি ছাড়া সেটায় কাজ হবে না।"

হরিশ্চন্দ্র উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে বললেন, "বলো কী! এই বাড়িতে?"

"যে আজ্ঞে। শুধু শুধু কি আর এ বাড়িতে থানা গেড়ে আছি মশাই?"

"তা আয়নাটা এখন কোথায়? একবার দেখা যায় না?"

মাথা নেড়ে লোকটা বলল, "নেই। সেটা হাওয়া হয়েছে।"



সে এক ম্যাজিকওলার ছেলে, যে ম্যাজিকওলা মাঝে মাঝেই অদৃশ্য হয়ে যেত, দিনের পর দিন তার দেখা পাওয়া যেত না। হিরুর মা ছিলেন না, এক বুড়ি দিদিমার কাছে মানুষ। বড্ড অনাদর ছিল তার, তাই সে হাপিত্যেশ করে বাবা কবে ফিরে আসবেন, তার জন্য পথ চেয়ে বসে থাকত।

অনেক-অনেক দিন পরে পরে বাবা হয়তো ফিরে আসতেন, কিন্তু বড্ড রোগা চেহারা নিয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে। তবু বাবা এসে তাকে পয়সা দিতেন। খাবার কিনে আনতেন, খেলনাও দিতেন একটা-দুটো। বাবা যে তার জন্যই রোজগার করতে গিয়ে গাঁয়ে-গ্রামান্তরে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ান, তা হিরু জানত। বড় কষ্ট হয় বাবার জন্য। বাবার সঙ্গে চলে যেতেও ইচ্ছে হত তার। কিন্তু বাবা রাজি হতেন না। বলতেন, "তুমি পড়াশোনা করো, আমার মতো জীবন তোমার জন্য নয় বাবা।"

সে এক বর্ষার রাত। হিরুর স্পষ্ট মনে আছে। বাবা সেদিনই বাড়ি ফিরেছেন, তাই হিরুর মনে ভারী আনন্দ। রাতে বাবার বুক ঘেঁষে শুয়ে সে মহা আরামে ঘুমিয়েছিল। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখতে পেল, বাবা একটু দূরে মেঝের উপর বসে একটা হাত-আয়নার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন। ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। আয়নার সঙ্গে কি কেউ কথা বলে?

চুপ করে শুয়ে চোখ সামান্য ফাঁক করে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দৃশ্যটা দেখছিল। হঠাৎ বুঝতে পারল, বাবা নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে প্রলাপ বকছেন না। আয়নায় দাড়ি-গোঁফওলা একটা অচেনা মুখ। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল হিরু।

ওটা কি ভুতুড়ে আয়না? বাবা কি ভূত-প্রেতের খেলা দেখান? হিরু কিছুই বুঝতে পারল না। তবে সেই ছোট বয়সেও সে বাবার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পেরেছিল, বাবা আয়নার ভূতটার সঙ্গে ভাব করতে চাইছেন।

পরপর দু'রাত একই ব্যাপার ঘটবার পর একদিন হিরু ঠিক করল, ব্যাপারটা দেখতে হবে। আয়নায় কথা বলার সময় বাবা যে গলায় ধুকধুকিটা ঝুলিয়ে নেন, এটা তার নজর এড়ায়নি।

সেদিন তার বাবা মদন তপাদার গাঁয়ের যাত্রা দেখতে গিয়েছেন। নিরালা ঘরে হিরু বাক্স খুলে আয়নাটা বের করল। এমনিতে আয়নাটা সাধারণ আয়নার মতোই। কিন্তু যেই গলায় লকেটটা ঝুলিয়ে নিল, সঙ্গে সঙ্গে আয়নায় একটা ভয়ংকর মুখ ভেসে উঠল। মাথায় লোহার টুপি, গালে দাড়ি-গোঁফ, চোখদুটো যেন জ্বলছে। সে পরিষ্কার শুনতে পেল, লোকটা উত্তেজিত গলায় অদ্ভুত এক ভাষায় কিছু বলতে চাইছে। 'হুরো... হুরো ... বুরুচ... পিরো...' এই ধরনের কথা। প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও হিরু বুদ্ধিমান ছেলে। সে খুব নরম করে বলল, "আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

লোকটা ভ্রু বেঁকাল। তারপর মুখের কাছে একটা হাত তুলে বলল, "রবিয়াল... রবিয়াল...।"

কথাটার মানে বুঝল না হিরু। কিন্তু তার কচি মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গলার লকেটটার মধ্যে কোনও ব্যাপার নেই তো! সে তাড়াতাড়ি লকেটটা তুলে ভাল করে দেখল। মনে হল পালোয়ানের

খোদাই করা ছবির বুকে একটা সূক্ষ্ম ফুটো আছে। সে ফুটোটার কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

লোকটা এবার বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে একটু হাসল।

লোকটার কথা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারল হিরু। লোকটা বলল, "তোমার খুব বুদ্ধি। আমার নাম বুরুচ। আমি অনেক অনেক দূরে থাকি।"

"আমার নাম হিরু। হিরু তপাদার। আমি জাদুকর মদন তপাদারের ছেলে।"

"তুমি বেশ ভাল একটি ছেলে। যদিও তুমি খুব ছোট্ট একটা ছেলে, তবু তোমাকে বলে রাখি, এই আয়নাটা একটা ভীষণ দামি আর জরুরি জিনিস। আমাদের জগৎ থেকে একজন তোমাদের পৃথিবীতে গিয়েছিল। ওই আয়না আর লকেট সে চুরি করে পালিয়ে যায়। তারপর সে হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওই দুটো মূল্যবান জিনিস তোমাদের গ্রহে পড়ে আছে। আমরা যে-কোনও মূল্যে ও দুটো ফেরত চাই।"

হিরু বলল, "বেশ তো, তুমি এসে এক্ষুনি নিয়ে যাও।"

লোকটা বলল, "শোনো বুদ্ধিমান ছেলে, আমাদের জগৎ থেকে তোমাদের জগতে যাওয়া সহজ নয়। অনেক সময় লাগবে। হয়তো তোমাদের হিসেবে আট-দশ বছর। কিন্তু আমাদের সৈন্যসামন্তরা ও দুটো জিনিস উদ্ধার করবেই। তখন যদি তারা বাধা পায়, তা হলে তারা ভয়ংকর সব অস্ত্র দিয়ে তোমাদের সব কিছু ধ্বংস করে ফেলতে পারে। আমাদের সৈন্যদের কোনও মায়াদয়া নেই, তার কারণ, তারা কলের তৈরি।"

"কিন্তু আমি তো ফেরত দিতেই চাইছি।"

"হ্যাঁ। তাই বলছি ও দুটো জিনিস খুব সাবধানে রেখো। খারাপ লোকের হাতে পড়লে সে এই দু'টি জিনিস এমনভাবে ব্যবহার

করবে, যাতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে। ওই আয়না থেকে নানা সময়ে নানা বিচ্ছুরণ ঘটে। তার কোনওটা ভাল, কোনওটা মন্দ। সব সময়ে ঢাকনাটা দিয়ে রেখো। আশা করি আমার কথা তুমি বুঝতে পেরেছ।"

"পেরেছি বুরুচ। কিন্তু আয়নাটা যদি ভেঙে-টেঙে যায়?"

"সেই ভয় নেই। পৃথিবীর কোনও শক্তি দিয়েই ওকে ভাঙা যাবে না।"

"ঠিক আছে বুরুচ।"

"আমার অভিবাদন নাও হিরু তপাদার।"

মদন তপাদার যখন যাত্রা দেখে ফিরেছিল, তখন হিরু গভীর ঘুমে। আর পরদিন খুব ভোরবেলায় মদন তপাদার তার বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে সেই যে বেরিয়ে গিয়েছিল আর তার সঙ্গে দেখাই হল না হিরুর। জরুরি কথাগুলো তাই মদন তপাদারকে বলাও হয়নি তার।

বছরখানেক পরে সে মদন তপাদারের একটা চিঠি পায়। তাতে লেখা—

বাবা হিরু,

আশা করি ঠাকুরের কৃপায় ভাল আছ। আমার শরীর খুব খারাপ, হয়তো বেশিদিন বাঁচব না। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে কি না কে জানে। কিন্তু একটা জরুরি কথা তোমাকে জানানো দরকার। আমার কাছে একটা অদ্ভুত আয়না আর একটা ধুকধুকি ছিল। আয়নাটা চৈতন্যপুরের রাজবাড়ির দরবার ঘরের পিছনে চোরাকুঠুরির উপরের কুলুঙ্গিতে লুকানো আছে। ধুকধুকিটা আমার জাদুর বাক্সে রয়েছে। আর সেটা আছে চৈতন্যপুরের মন্টুরাম সিংহের বাড়িতে। বড় হয়ে যদি পারো, এ দুটো উদ্ধার করার চেষ্টা কোরো। এই গ্রামে আমার এক চেলা আছে। তার নাম সুধীর গায়েন। সে চোর। চোরেদের অনেক অন্ধিসন্ধি জানা থাকে।

বাবা হিরু, এই আয়নার মহিমা কী, তা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু আশা আছে, তুমি হয়তো বুঝতে পারবে।

ইতি

তোমার বাবা মদন তপাদার

দরবার ঘরের পিছনে চোরাকুঠুরিতে ঢোকার সহজ পথ নেই। কয়েকদিন নিরীক্ষণের পর হিরু আবিষ্কার করল, ভাঁড়ার ঘরে বেদির মতো উঁচু যে উনুন আছে, তার নীচের ছিদ্রপথে হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকা যায়। একখানা টর্চ নিয়ে হেঁচড়ে মেচড়ে ঢুকে প্রায় তেরো-চোদ্দো ফুট উঁচু কুলুঙ্গিতে উঠে খুঁজেও দেখল। কিন্তু আয়না সেখানে নেই। তবু ছোট ঘরখানার আনাচ কানাচ তন্নতন্ন করে খুঁজল হিরু। নেই।

হিসেবমতো বুরুচের সৈন্যসামন্তদের এসে পড়ার সময় হয়ে গিয়েছে। যদি আয়নাটা না পাওয়া যায়, তা হলে তারা যে কী ভীষণ কাণ্ড করবে কে জানে। হিরু ভারী চিন্তিত হয়ে মেঝের ধুলোবালির উপর কিছুক্ষণ বসে রইল। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার ঘর। নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল হিরুর। হয়তো অক্সিজেনের অভাব ঘটছে। আর মনে হচ্ছে, চারদিকে আবহের মধ্যে একটা যেন ফিসফাস, গুজগুজ হচ্ছে। কারা যেন হাঁটছে-চলছে বা বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। হিরু তটস্থ হল। এখন যদি সে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যায়, তা হলে ওই ঘরেই মরে পড়ে থাকতে হবে। সে ফের হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল।

বিকেলে হরিশ্চন্দ্র বারান্দায় তাঁর কেঠো চেয়ারটায় বসে ছিলেন। দেখা হতেই একগাল হেসে বললেন, "কী হল? পেলে না তো?"

হিরু ভারী অবাক হয়ে রাজামশাইয়ের পায়ের কাছটিতে বসে বলল, "কী পেলাম না রাজামশাই?"

হরিশ্চন্দ্র বললেন, "কেন, সেই আয়নাটা?"

হিরু আরও এক ডিগ্রি অবাক হয়ে বলে, "আয়নার কথা আপনি জানলেন কী করে?"

হরিশ্চন্দ্র বললেন, "সে আর জানা শক্ত কী! এ বাড়িতে বাতাসে কান পাতলে মেলা গুজগুজ, ফিসফাস শোনা যায়, বুঝলে!"

হিরু একটু চিন্তিত হয়ে বলে, "তা বটে রাজামশাই। কিন্তু ওই গুজগুজ আর ফিসফাস থেকে আয়নার একটা হদিশ কি পাওয়া যায় না মহারাজ?"

হরিশ্চন্দ্র ভ্রু কুঁচকে একটু ভেবে বললেন, "বাপু হে, গুজগুজ যে আমাকে খুব একটা মান্যিগণ্যি করে, তা তো নয়। আর ফিসফাসের কথা যদি বলো, তা হলে বলতে হয় তার নাগাল পাওয়া বেশ শক্ত। হাওয়া-বাতাসের মতো আসে আর চলে যায়, বুঝলে!"

"আজ্ঞে, বেশ বুঝেছি।"

"তা বাপু, বুড়ো বয়সের দোষে আজকাল লোকের নামধাম বড্ড ভুলে যাই। তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে! হিরু তপাদার না কী যেন!"

হিরু অধোবদন হল। তারপর একটু অনুতাপ মেশানো গলায় বলল, "আজ্ঞে মহারাজ, ও নামটা আমি আপনাকে বলিনি। আমি বলেছি হিরু গণপতি। ওটা অবশ্য মিছে কথা। আমি জাদুকর মদন তপাদারের ছেলে হিরু তপাদারই বটে।"

"হ্যাঁ, ফিসফাস যেন তাই বলে গেল।"

হিরু তাড়াতাড়ি হরিশ্চন্দ্রের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, "মহারাজ, সবই আপনাকে খুলে বলছি। দয়া করে আপনার গুজগুজ আর ফিসফাস ধরে করে আমার কাজটা উদ্ধার করে দিন।"





গোবিন্দ ঘোষের সঙ্গে যে মন্টুরাম সিংহের চিরকালের আড়াআড়ি, এ কে না জানে। কিন্তু গোবিন্দ ঘোষের কপালের দোষে তাঁর বাড়িটা ওই মন্টুরামের বাড়ির একদম লাগোয়া। গোবিন্দ ঘোষের ফলন্ত মধুগুলগুলি আমগাছের সবচেয়ে বেশি আম ধরে যে ডালটায়, সেটাই মন্টুরামের বাগানের দিকে ঝুঁকে থাকে, গোবিন্দ ঘোষের নারকোলগাছের নারকোল প্রায়ই গিয়ে পড়ে মন্টুরামের বাগানে। ছাদে শুকোতে দেওয়া গোবিন্দ ঘোষের গেঞ্জি আর লুঙ্গি কতবার যে হাওয়ায় উড়ে মন্টুরামের বাড়ির ছাদে গিয়ে পড়েছে, তার হিসেব নেই।

আর ওদিকে মন্টুরামের বাড়িতে মাংস রান্না হলে সেই গন্ধ এসে গোবিন্দ ঘোষের বাড়িতে দাপাদাপি করে বেড়ায়। গোবিন্দ দাঁত কিড়মিড় করেন। মন্টুরামের বাড়িতে বিরিয়ানি হচ্ছে। তার গন্ধ গোবিন্দর বাড়িতে লুঠেরার মতো ঢুকে সব তছনছ করে দেয়। মাছের মুড়ো দিয়ে সোনামুগের ডাল রান্না হলে তো গোবিন্দকে নাকে চাপা দিতে হয়। গন্ধগুলো যেন এসে তাঁকে মুখভেংচি দেয়, বক দেখায়, মাথায় চাঁটি মেরে বলে যায়, “দুয়ো রে গোবিন্দ, দুয়ো!”

গোবিন্দ একদিন মন্টুরামকে উচিত শিক্ষা দিতে তাঁর গিন্নি বাসন্তীকে বললেন, “হ্যাঁ গা, আজ একটু শুঁটকি মাছ রাঁধো তো।”

বাসন্তী চোখ কপালে তুলে বলেন, "শুঁটকি মাছ! বলো কী! আমরা তো কস্মিনকালেও শুঁটকি মাছ খাই না!"

"আহা, খাওয়ার কথা উঠছে কেন? খাওয়ার জন্য নয় গিন্নি, গন্ধটা ছড়ালে মন্টুরামকে একটু শিক্ষা দেওয়া হবে।"

বাসন্তী রাগ করে বলেন, "আ মোলো, অন্যকে শিক্ষা দিতে গিয়ে শুঁটকি রেঁধে মরি আর কী।"

"তা হলে এক কাজ করো। শুনেছি চামড়া পোড়ালে কী বিচ্ছিরি গন্ধ হয়। তা হলে আমার পুরনো ছেঁড়া পাম্পশুটা নিভন্ত উনুনে গুঁজে রাখো। দেখি, ব্যাটা দাপিয়ে বেড়ায় কি না।"

বাসন্তী বললেন, "মন্টুবাবু দাপিয়ে বেড়াবে কি না জানি না বাপু, তবে চামড়া-পোড়া গন্ধে আমরাই কি বাড়িতে টিকতে পারব?"

তাই তো! এ কথাটা তো খেয়াল হয়নি! গোবিন্দবাবু খুব ভাবনায় পড়লেন। গত ত্রিশ বছর ধরে গোবিন্দ ভেবেই চলেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত মন্টুরামকে শিক্ষা দেওয়ার মতো তেমন কিছুই করে উঠতে পারেননি।

এক রাতে গোবিন্দ ঘোষের বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। টের পেয়ে গোবিন্দ ঘোষ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তেড়ে উঠলেন, "এটা তোদের কীরকম একচোখোমি বল তো! পাশেই মন্টুরামের বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়িতেই কেন ঢুকেছিস? এ কীরকম বিচার তোদের?"

চোরটা ভড়কে গিয়ে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

গোবিন্দ ঘোষ মশারি তুলে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে হাত-পা ছুড়ে বলতে লাগলেন, "লজ্জা করে না তোদের? ঘেন্না হয় না? যার বাড়িতে সোনাদানা উপচে পড়ছে, টাকা রাখার জায়গা নেই, দামি দামি জিনিস ছড়িয়ে পড়ে থাকে, তার বাড়ি ছেড়ে কোন লজ্জায় এ বাড়িতে ঢুকেছিস?"

চোরটা মিনমিন করে বলল, "তা কী করব মশাই, মন্টুরামবাবুর

বাড়িতে যে সড়ালে কুকুর আছে, পাইক-বরকন্দাজ আছে।"

গোবিন্দ খাপ্পা হয়ে বললেন, "ওঃ যেন পুষ্যিপুত্তুর এলেন! কুকুর আছে, পাইক-বরকন্দাজ আছে। আর তাতেই বাবুর জারিজুরি বেরিয়ে গেল! পাইক-বরকন্দাজ আর কুকুরকেই যদি ভয়, তা হলে চুরি ছেড়ে বোষ্টম হলেই পারিস। তোদের মতো চোরকে কুলাঙ্গার বললে কম বলা হয়। এই যদি তোর এলেম, তা হলে গলায় দড়ি দিগে যা। জলে ডুবে মরগে যা। ছিঃ ছিঃ, তোদের মুখদর্শন করলে পর্যন্ত পাপ হয়।"

চোরটা তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

তবে হঠাৎ এই সেদিন নৈরাশ্যের মধ্যে একটু আশার আলো দেখতে পেলেন গোবিন্দ ঘোষ। গাঁয়ের চৌকিদার ভজহরির কাছে শুনলেন যে, মন্টুরামের বাড়িতে একদিন একটা চোর ঢুকেছিল। কপালের ফেরে সে কিছু চুরি করতে পারেনি, সারারাত একটা আলমারির মধ্যে আটকে থেকে পরদিন মন্টুরামের হাতে ধরা পড়ে যায়। তবে মন্টুরামের বউ হরিমতী তাকে দয়া করে ছেড়ে দেন।

গোবিন্দ ঘোষ খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "চোরটার নাম-ধাম কী জানো? মন্টুরামের বাড়িতে যে ঢুকতে পারে, সে কিন্তু সোজা চোর নয়।"

ভজহরি বলল, "সেটা খুব ঠিক কথা গোবিন্দবাবু। সুধীর গায়েন একজন নাটা চোর বটে, কিন্তু কাজের লোক। চোর দেখে দেখে তো আমার চোখ পেকে গিয়েছে, তাই দেখলেই চিনতে পারি।"

"তা সে কোথায় থাকে বলো তো?"

"এ গাঁয়ের লোক নয়, তবে এখানে-সেখানে খুঁজলে পেয়ে যাবেন। চার ফুটিয়া চোর। রোগা চেহারা। কালও দেখেছি দুপুরে কালীবাড়ির চাতালে বসে মুড়ি-তেলেভাজা খাচ্ছে।"

এ চোরকে খুঁজে বের না করলেই চলছে না। সুতরাং গোবিন্দ

ঘোষ তক্কেতক্কে রইলেন। দিন দুইয়ের মাথায় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রথতলা বাজারে কেষ্ট সাহুর দোকানের সামনে পেয়েও গেলেন তাকে। ছোটখাটো মানুষ, বসে মুড়ি আর ঘুগনি খাচ্ছে।

"সুধীর গায়েন নাকি হে তুমি?"

সুধীর একটু অবাক হয়ে বলে, "যে আজ্ঞে।"

বেঞ্চে তার পাশেই জুত করে বসে গোবিন্দ ঘোষ বললেন, "ওহে সুধীর, ইংরিজিতে একটা কথা আছে জানো? ট্রাই-ট্রাই-ট্রাই এগেন। ওর বাংলা করলে দাঁড়ায় একবারে না পারিলে দ্যাখো শতবার।"

সুধীর কথাটা একরকম স্বীকার করে নিয়ে বলল, "তা তো ঠিকই গোবিন্দবাবু।"

"তুমি কি আমাকে চেনো নাকি হে?"

"গাঁয়ের সবাইকেই চিনি। না চিনলে আমাদের কাজকারবার চলবে কী করে?"

"অতি সত্যি কথা, অতি সত্যি কথা।"

"মন্টুরাম সিংহের পাশের বাড়িটাই তো আপনার। ছাদের দরজার ছিটকিনিটা একটু আলগা আছে। টয়লেটের জানালার গ্রিল একটু নড়বড়ে, তিনটে স্ক্রু নেই। দরদালানের দেওয়ালে নোনা ধরেছে। আপনার সোনাদানা ব্যাঙ্কের লকারে।"

আহ্লাদে গোবিন্দ ঘোষের চোখে প্রায় জল এসে গেল। গদগদ কণ্ঠে বললেন, "এই না হলে গুণী মানুষ! আহা, বড় আনন্দ হচ্ছে আজ। এই নাও সুধীর, এই একশোটা টাকা রাখো। আজ একটু ভাল-মন্দ খেয়ো। এটাকে বকশিশ বলে ভেবো না কিন্তু, বলতে পারো গুণীর নজরানা।"

সুধীর টাকাটা পকেটস্থ করে বলে, "তা গোবিন্দবাবু কথাটা কী?"

গোবিন্দ ঘোষ গলাটা নামিয়ে বললেন, "দুর্গম গিরি কান্তার মরু

দুস্তর পারাবার হে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। বুঝলে কিছু?”

“বেশ গা গরম করা কবিতা মশাই!”

“তাই তো বলছি ভাল করে একটু তেতে ওঠো তো বাপু। হাল ছেড়ে দিলে তো হবে না। হাল বেশ সাপটে ধরতে হবে।”

“মশাই, আপনি কি মন্টুরামের বাড়িতে ফের ঢুকতে বলছেন? তাতে লাভ কী? আমি যে জিনিসটা খুঁজতে প্রাণ হাতে করে ও বাড়িতে ঢুকেছিলাম, তা কোথায় রাখা আছে, তা না জানলে সুবিধে হবে না। অত বড় বাড়ি, অত ঘর, বিস্তর আলমারি, বাক্সপ্যাঁটরা। মেহনতে পোষাবে না যে!”

গোবিন্দ ঘোষ গম্ভীর হয়ে বললেন, “দ্যাখো বাপু, ও বাড়ির অন্ধি-সন্ধি আমার মুখস্থ। গত ত্রিশ বছর ধরে নানা ফাঁক-ফোকর দিয়ে দিনে-রাতে আমি মন্টুরামের উপর নজর রাখি। তার কোন জিনিসটা কোথায় রাখা আছে তা আমার নখদর্পণে। একবার উচ্চারণ করেই দ্যাখো।”

সুধীর ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, “সেটা একটা ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো চামড়ার সুটকেস। তাতে দামি জিনিসপত্র নেই বটে, কিন্তু বাক্সটা বড়ই দরকার।”

“ছোঃ, ও একটা জিনিস হল হে বাপু? ও বাড়িতে ঢুকবেই যদি তবে সব চেঁছে-পুঁছে নিয়ে এসো। নইলে যে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ হবে।”

ভারী লাজুক হেসে হেঁটমুন্ডু হয়ে সুধীর বলে, “তা ঢুকতে পারলে কি আর খালি হাতে বেরোব মশাই? তবে ওই বাক্সখানাও চাই।”

“তার আর চিন্তা কী! যে বাক্সখানার কথা বলছ, সেটা এতকাল মন্টুরামের শোওয়ার ঘরের স্টিলের আলমারির মাথায় অচ্ছেদ্দার সঙ্গে রাখা ছিল। এই দিন কয়েক আগে দেখি সেটাকে মন্টুরাম

সরিয়ে নিয়ে ছাদের উপর স্ট্রংরুমের সিন্দুকে রেখেছে। তাতে কোন হিরে-জহরত আছে, কে জানে। কিন্তু রোজই মাঝরাতে উঠে মন্টুরাম বাক্সটা খুলে তাকিয়ে থাকে আর বিড়বিড় করে কথা কয়। একটা পুরনো লজ্ঝড়ে চামড়ার সুটকেস তো?”

সুধীর লাফিয়ে উঠে বলে, “ওইটেই। কিন্তু স্ট্রংরুম তো কঠিন ব্যাপার-স্যাপার মশাই।”

গোবিন্দ ঘোষ বরাভয়ের মুদ্রায় হাত দেখিয়ে বললেন, “ওরে বাপু, লখীন্দরের বাসরেও ছ্যাঁদা ছিল। বুঝলে? যত বজ্র আঁটুনি, তত ফসকা গেরো। ত্রিশ বছর ধরে মন্টুরামের বাড়িখানা নিয়ে যে গবেষণা করে যাচ্ছি, তা তো আর এমনি নয়। স্ট্রংরুমের দেওয়ালে একখানা একজস্ট ফ্যান লাগানো আছে। ছ্যাঁদার যা সাইজ, তা দিয়ে অনায়াসে তুমি ঢুকতে পারবে। শুধু একজস্ট ফ্যানটা খুলে ফেলার ওয়াস্তা।”

সুধীর বড় বড় চোখে গোবিন্দ ঘোষের দিকে তাকিয়ে বলে, “মশাই, আপনি তো ইচ্ছে করলেই...?”

গোবিন্দ মৃদু হেসে বললেন, “ওরে বাপু, চোর আর গোয়েন্দায় তফাত কিছুই নেই। শুধু প্রয়োগ আলাদা।”

সুধীর একটু দোনোমোনা করে বলে, “আমি ধরা পড়ার পর মন্টুবাবু বাড়িতে পাহারা বাড়িয়েছেন। এখন ঢোকা আর একটু কঠিন হবে।”

গোবিন্দবাবু চাপা গলায় বললেন, “তা হলে আর আমি আছি কী করতে? পাহারা সব নীচে। তা ছাড়া পিছন দিকটা, যেদিকে আমার বাড়ি, সেদিকটায় পাঁচিলে মন্টুরাম চোরের ভয়ে শূল বসিয়েছে, নীচের বাগানে ফণীমনসা, বিছুটি আর নানারকম কাঁটাগাছ লাগিয়েছে, যাতে কেউ ঢুকতে না পারে। ফলে ওদিকটায় পাহারা থাকে না। আমার তিনতলার ছাদ থেকে মন্টুরামের ছাদ মাত্র দশ ফুট

তফাত। বুঝলে? দু'খানা লম্বা বাঁশ পাশাপাশি ফেললে একেবারে হাওড়ার ব্রিজ হয়ে গেল হে।"

এবার সুধীর গদগদ হয়ে বলল, "একটু পায়ের ধুলো দিন গোবিন্দবাবু।"

"আহা, থাক থাক। ওসব হবেখন। আগে মন্টুরামের গুমর তো ভাঙুক। ত্রিশ বছর ধরে যে জ্বলুনি-পুড়ুনি সইছি, সেই জ্বালা আগে জুড়োক।"

"বাক্সটা কি সিন্দুকে রাখা থাকে বললেন গোবিন্দবাবু?"

"হ্যাঁ। তবে চিন্তা নেই। সিন্দুকের চাবিটা মস্ত আর ভারী বলে ওটা মন্টুরাম স্ট্রংরুমেই দেওয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে যায়।"

"নাঃ গোবিন্দবাবু, এবার পায়ের ধুলোটা না নিলে পাপ হয়ে যাবে। দেখবেন একদিন আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। সোনার দরে পুরিয়া করে বিক্রি হবে।"

গোবিন্দবাবু একটু তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, "একটা কথা মনে রেখো বাপু, শুভস্য শীঘ্রম। কথাটার মানে হল, ওরে তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী। আজ হল গিয়ে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী। পঞ্জিকা দেখে রেখেছি, আজ বড় ভাল দিন।"

"যে আজ্ঞে।"

রাত আড়াইটে নাগাদ যখন গোটা চৈতন্যপুর ঘুমে অচেতন, তখন মন্টুরামের পাহারাদাররা সামান্য তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, সড়ালে কুকুরেরা থাবায় মুখ রেখে ঝিমিয়ে নিচ্ছে, মন্টুরাম যখন স্ট্রংরুমে মদন তপাদারের সুটকেসটা আরও একবার দেখে দু'নম্বর মন্টুরামের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে নীচে নেমে এসে সবে খাটে শুয়েছেন, ঠিক এই সময়ে জোড়া বাঁশের সাঁকো বেড়ালের মতো পেরিয়ে গেল সুধীর গায়েন। এপাশের ছাদে বাঁশ দুটো শক্ত করে চেপে

ধরে রেখে গোবিন্দ ঘোষ খুব হাসছিলেন। আহা, এতদিনে তাঁর একটা সাধ পূরণ হল। তিনি বিড়বিড় করে বলছিলেন, "জয় দুর্গা, জয় কালী, জয় বাবা বিশ্বনাথ, জয় মা শীতলা, জয় তারা, কাজটা ভালয় ভালয় উতরে দাও। মন্টুরামের সব যেন চেঁছে-পুঁছে আনতে পারে ছোঁড়া।"

তা দেবতারা গোবিন্দ ঘোষের ডাকাডাকি বোধহয় আজ শুনতে পেলেন। আধঘণ্টা পরে দেখা গেল সুধীর এক হাতে একটা বাক্স আর অন্য হাতে একটা থলি নিয়ে একটু টলমল পায়ে সাঁকো ডিঙিয়ে আসছে।

উত্তেজনার বশে গোবিন্দবাবু একটু জোরেই চেঁচিয়ে ফেলেছিলেন, "জয় মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী!"

তাতে গোটা দুই কাক কা-কা করে উঠল। ভজহরির হাঁক শোনা গেল, "কৌন হ্যায় রে!" একটা সড়ালে কুকুরও যেন সন্দিহান হয়ে বারকয়েক ঘেউঘেউ করে উঠল। গোবিন্দ প্রমাদ গুনলেন। বুক কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে আসছিল উত্তেজনায়। চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

মাঝপথে একটু পড়ো পড়ো হয়েছিল সুধীর। কিন্তু সামলে নিল। বাঁশে একটু মচাৎ মচাৎ শব্দ হচ্ছিল যেন। তিরে এসে তরী না ডোবে! গোবিন্দ ঘোষ দাঁতে দাঁত চেপে বাঁশ ধরে রইলেন।

সুধীর হাসিমুখে এই ছাদে এসে লাফ দিয়ে নেমে নিচু হয়ে গোবিন্দর পায়ের ধুলো নিল। গোবিন্দ ঝটিতি বাঁশ দুটো টেনে নিয়ে ছাদের একধারে শুইয়ে রেখে বললেন, "শাবাশ! সব চেঁছে-পুঁছে এনেছ তো?"

সুধীর বলল, "তা মশাই কম হবে না। গিনি আর সোনার বিস্কুটে তিন-চার কেজি তো হবেই।"

গোবিন্দ বললেন, "পাঁচ-সাত কেজি হলে ভাল হত হে।"

"সোনাদানা তো জীবনে খুব বেশি ঘাঁটিনি মশাই। সোনার যে এত ওজন, তা কে জানত!"

"যাক গে বাপু, যা হয়েছে তাই হয়েছে। এবার এসো গিয়ে।"

"আজ্ঞে, আপনার ভাগটা রেখে দিন। আধাআধি বখরা।"

গোবিন্দ ঘোষ আঁতকে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! ভাগজোখের কথা উঠছে কেন? স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরোধর্ম ভয়াবহ। এর মানে জানো? যার কর্ম তারে সাজে, অন্যের হাতে লাঠি বাজে।"

সুধীর হাঁ করে খানিক চেয়ে থেকে বলে, "এই এত সব আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন গোবিন্দবাবু? কিন্তু আপনি যে এত কষ্ট করলেন, মদত দিলেন, এর কি কোনও মজুরি নেই?"

"পাগল নাকি? চোরের ধর্ম আর গেরস্তের ধর্ম আলাদা বাপু।"

"তা হলে আসি আজ্ঞে," বলে সুধীর তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিল।

গোবিন্দ ঘোষ এসে বিছানায় শুলেন। বুকটা আজ ভারী ঠান্ডা। মনটায় বেশ শান্তি পাচ্ছেন।

সকালবেলায় তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবী তাঁকে ঠেলে তুললেন, "ওগো, ওঠো! ওঠো! মন্টুরামের বাড়িতে নাকি কাল রাতে মস্ত চুরি হয়ে গিয়েছে!"

গোবিন্দ ঘোষ হাই তুলে ভারী আদুরে গলায় বললেন, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। মন্টুবাবু দারোগা-পুলিশ নিয়ে ওঁদের ছাদে উঠে আমাদের বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে কী যেন দেখাচ্ছেন!"

আঁতকে উঠে গোবিন্দ বললেন, "আমাদের বাড়ির দিকে? আমাদের বাড়ির দিকে দেখাচ্ছে কেন?"

"তার আমি কী জানি। একটু আগে মন্টুরামের বাঘা কুকুরগুলো এসে আমাদের বারান্দা-দরজা সব শুঁকছিল। তাদের কী রাগ, যেন

ছিঁড়ে খায় আমাদের। ভাগ্যিস শিকলে বেঁধে এনেছিল।”

গোবিন্দ ঘোষ কাহিল গলায় বলেন, “কুকুর কোন সাহসে আমার বাড়ি শুঁকতে আসে?”

“এই তো পটলা ও বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বলল, কানাই দারোগা নাকি আমাদের বাড়িতেও আসবে।”

গোবিন্দ ঘোষ টপ করে উঠে বললেন, “থলিটা দাও, বাজার সেরে আসি।”

বাসন্তীদেবী বললেন, “ওমা! কালই তো বাজার করেছ! আজ আবার বাজার কীসের?”



বলতে গেলে এটাই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। এত সোনা সে জীবনে দ্যাখেনি। তার উপর মদন তপাদারের বাক্সখানা। এটা থেকেও কিছু আয় হবে। সে এখন কত লাখ টাকার মালিক তা বুঝে উঠতে পারছিল না সুধীর গায়েন। এত টাকা নিয়ে কী করতে হয়, তাও সে জানে না। তবে টাকা হলে শিখে নিতে দেরি হবে না। তার ইচ্ছে গরিব-দুঃখীকেও কিছু দেবে। তবে একটা আহাম্মকির কাজ হয়েছে। মন্টুরামের বাড়িতে ধরা পড়ে সে কবুল করে ফেলেছিল যে, মদন তপাদারের বাক্স চুরি করতেই সে ও বাড়িতে ঢুকেছে। সুতরাং এখন পুলিশ হন্যে হয়ে তাকে খুঁজবে। অতএব আজ রাতেই তাকে এই গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে অনেকটা তফাত হতে হবে।

সুধীর একটু তাড়াতাড়িই হাঁটছিল। মনে আনন্দ, শিহরন, উত্তেজনা। চারদিকটা সে যেন ভাল করে খেয়াল করতে পারছে না।

চৌপথীর ঠিক মাঝখানে মন্টুরামের দাদু স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়রাম সিংহের একটা প্রমাণ সাইজের ব্রোঞ্জমূর্তি। শ্বেতপাথরের বেদির উপর দাঁড় করানো। সেই মূর্তিটা যখন পেরিয়ে যাচ্ছিল সুধীর, সেই সময়ে একটা খুব সূক্ষ্ম নড়াচড়া টের পেল সে। কিন্তু সতর্ক হওয়ার আগেই কালো মূর্তিটাই যেন লাফিয়ে নেমে এল তার সামনে। কালো কাপড়ে ঢাকা মুখ, লম্বা আর চওড়া মূর্তিটা

ভাল করে ঠাহর করার আগেই তার মাথায় কঠিন একটা জিনিস এসে লাগল। কিছু বুঝে ওঠার সময় পেল না সে। চোখ অন্ধকার হয়ে গেল, মাথাটা ভোঁ হয়ে গেল, সে অজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়।

যখন জ্ঞান ফিরল, তখনও আলো ফোটেনি। সুধীর মাথাটা চেপে ধরে উঠে বসে খানিকক্ষণ তার কী হয়েছে বুঝবার চেষ্টা করল। কপালের ডান দিকে একটা ঢিপলি আঙুলে টের পেল সে, আর অসহ্য যন্ত্রণা। একটু-একটু করে ঘটনাটা মনে পড়ল তার। ব্রোঞ্জমূর্তি তার উপর যে লাফিয়ে পড়েনি, তাও বুঝতে পারল সে। মূর্তির সঙ্গে মিশ খেয়ে যে গা ঢাকা দিয়েছিল, তাকেও সে বোধহয় বিলক্ষণ চেনে। কালোবাবু যে ভয়ংকর লোক, তাও তার অজানা ছিল না। কিন্তু লোকটা যে এত ধুরন্ধর তা আন্দাজ করতে পারেনি।

সুধীর বুঝতে পারল, চুরির মাল হাতছাড়া, সুটকেস হাওয়া, সে এখন পুনর্মূষিক। তার উপর ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তেড়ে আসবে। সুতরাং সে উঠে পড়ল এবং জোর কদমে হেঁটে এবং খানিকটা ছুটে চৈতন্যপুরের সীমানা ডিঙিয়ে গেল।

ভোরের বাস ধরে ঘণ্টা দুয়েক বাদে একেবারে পাথরপোঁতায় বাঁকাবাবার ঠেকে পৌঁছে হাঁফ ছাড়ল সে। ভোরের আলো ফুটে গিয়েছে। পাখিপক্ষী ডাকাডাকি করছে। বাঁকাবাবার ঠেকে আজ কোনও লোকজন নেই। বড্ড ফাঁকা। বাবা বোধহয় যোগনিদ্রা থেকে এখনও ওঠেননি।

সুধীরের কোনও তাড়া নেই। মনটা বড্ড খারাপ। সে একটা পরিষ্কার গাছতলা বেছে নিয়ে তার তলায় গামছাটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

ঘুম ভাঙল ঠিক দুপুরবেলায়। শরীরে জ্বরভাব। পেটে খিদে, কণ্ঠায় তেষ্টা। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চারদিকটা চেয়ে দেখতে গিয়েই নজরে পড়ল, শিয়রে সেই বুড়ো লোকটা বসে আছে। তাকে চোখ মেলতে দেখেই বলল, "আহাম্মকির গুনোগার দিতে হল তো!"

একটা শ্বাস ফেলে উঠে গাছে ঠেস দিয়ে বসে সুধীর বলল, "এখন আপনার বিশ্বাস হল তো যে, আমি মোটেই ভাল চোর নই!"

"চুরি পর্যন্ত তো সব ঠিকঠাকই ছিল হে। গণ্ডগোল তো করলে পালানোর সময়।"

মাথা নেড়ে সুধীর বলে, "চুরিটাও ঠিকঠাক হল কোথায়? গোবিন্দবাবুই তো সুলুকসন্ধান বাতলে দিলেন। আমার কেরদানি আর কতটুকু?"

"যারা বড় চোর হয় ভাগ্যও তাদের সঙ্গে থাকে কিনা। গোবিন্দ ঘোষ তো নিমিত্ত মাত্র।"

"দূর মশাই, ও কথায় আর ভবি ভুলবার নয়। তবে আপনি যে আমাকে দেড় হাজার টাকা দিয়েছিলেন, তাতে আমার মেলা উপকার হয়েছে। খেটেপিটে টাকাটা একদিন শোধ দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।"

"আর চোরের উপর যে বাটপাড়ি করল তাকে কি ছেড়ে দেবে?"

সুধীর একটা শ্বাস ফেলে বলল, "কালোবাবুকে আপনি চেনেন না। চিনলে ওকথা বলতেন না। সাত-আটটা খুন ছাড়া অনেক ডাকাতির কেসও আছে ওঁর নামে। তাগড়াই চেহারা, কোমরে দুটো-তিনটে পিস্তল, ছোরা, এইসব থাকে সব সময়ে। বাড়িঘর কোথায়, কেউ জানে না। হঠাৎ উদয় হন। তারপর

কোথায় হাওয়া হয়ে যান। ওরকম লোকের সঙ্গে আমাদের কি পাল্লা দেওয়া চলে?”

“তুমি যে বড্ড লাতন হয়ে পড়েছ হে!”

“হওয়ারই কথা কিনা। মাথা টনটন করছে, অত সোনাদানা হাতছাড়া, পিছনে পুলিশ তাড়া করে আসছে। আমার অবস্থায় যদি আপনি পড়তেন, তবে বুঝতেন।”

বুড়ো লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, “তা বটে। তোমার অবস্থাটা এখন অত সুবিধের নয়।”

সুধীর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, “একটা কথা বলবেন মশাই? আমি যে এখানে আছি, সেই সন্ধান আপনাকে কে দিল?”

“সন্ধান? সন্ধান আর কে দেবে! প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে হঠাৎ দেখি, তুমি গাছতলায় শুয়ে আছ।”

“মশাই, এখন কম করেও বেলা বারোটা বাজে। এ সময়ে কেউ কি প্রাতর্ভ্রমণে বেরোয়?”

“ওঃ, তাও তো বটে! বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে দেখছি! তা হলে চলো, ওঠা যাক।”

“আমার যাওয়ার যে কোনও জায়গা নেই মশাই! কিছুদিন এখন গা ঢাকা দিয়ে এই বাঁকাবাবার ঠেকেই পড়ে থাকতে হবে।”

“বাঁকাবাবার আশ্রম! সেটা কোথায় বলো তো?”

“কেন, ওই যে কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে, বাবা ওখানেই থাকেন। সামনে যে মাটির বেদি দেখছেন ওখানে বসেই ভক্তদের দেখা দেন।”

“ওইটে বাঁকা মহারাজের ঠেক বুঝি! বাঃ! বেশ ভাল ব্যবস্থা তো! কানাই দারোগাও সেদিন বলছিলেন বটে যে, পাথরপোঁতায়

বাঁকা মহারাজের আশ্রমে গেলে ভারী শান্তি পাওয়া যায়। আর মন্টুরাম তো তাঁর মেয়ের হাঁপানির ওষুধ নিতে প্রায়ই চলে আসেন গাড়ি চালিয়ে।”

সুধীর টপ করে উঠে পড়ে বলল, “জানি আপনি মিছে কথা কইছেন, তবু আপনার মিথ্যে কথাটাকে সত্যি বলে না ধরে আমার উপায় নেই। চলুন, কোথায় যেতে হবে।”

বুড়ো মানুষটা হাত তুলে বলে, “রোসো বাপু, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। লক্ষ করেছ কি যে, তোমার বাঁকা মহারাজের আশ্রমে কোনও লোকজন দেখা যাচ্ছে না।”

সুধীর একটু অবাক হয়ে বলে, “তাই তো! কাল সকালেও মেলা লোকজন ছিল! গতকালই তো এসে বাবার আশীর্বাদ নিয়ে তবে মন্টুরামের বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছি।”

“চলো, ব্যাপারটা দেখা যাক।”

দেখা গেল, বাঁকা মহারাজের ঠেক একেবারে ফাঁকা। কুঁড়েঘরখানায় কোনও তৈজসপত্র, লোটাকম্বল বা আর কিছুই নেই।

“তোমার বাঁকা মহারাজ কি যোগবলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন নাকি হে সুধীর?”

“আজ্ঞে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।”

চারদিকটা ঘুরে দেখতে দেখতে বুড়ো মানুষটা বলল, “যোগবলে অদৃশ্য হওয়ার চেয়ে মোটরবাইকে অদৃশ্য হওয়া ঢের সোজা। মাটির উপর এই মোটরবাইকের চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছ তো!”

চারদিকটা দেখতে দেখতে বুড়ো মানুষটা খুব আনমনে বলল, “বাপু হে, পাথরপোঁতা নামটা শুনলে তোমার কিছু মনে পড়ে না?”

"না। শুধু জানি এ হল বাঁকাবাবার ঠেক।"

"চোরেদের স্মৃতিশক্তি তো খুব ভাল হওয়ার কথা! একবার যা দ্যাখে, একবার যা শোনে, তা সহজে ভোলে না। কী বলো হে?"

হঠাৎ সুধীর থমকে দাঁড়াল। তারপর বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, পাথরপোঁতা তো মদন তপাদারের গ্রাম! মনে পড়েছে!"

"ঠিক ধরেছ।"

"কিন্তু তাতে আর কী যায়-আসে বলুন।"

"তা তো ঠিকই। কী আর যায়-আসে। তবে কী জানো, মদন তপাদারের একটা ছোট্ট ছেলে ছিল। হিরু তপাদার।"

সুধীর মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ছেলের কথা বলে খুব দুঃখ করতেন। মা-মরা ছেলে।"

"সেই ছেলেটার খোঁজখবর করতে তোমার ইচ্ছে যায়নি?"

মাথা নেড়ে সুধীর বলল, "আজ্ঞে না। খোঁজ নিয়ে কী করব বলুন। আমার নিজেরই পেট চলে না, সেই ছেলের কোন উপকারে আসতে পারতাম? তবে মাঝে মাঝে মনে যে পড়ত না, তা নয়। মদনবাবুর মৃত্যুর জন্য আমিও তো খানিকটা দায়ী।"

"বাপু সুধীর, যা মনে হচ্ছে তোমার বাঁকা মহারাজ আর সহজে এখানে উদয় হবেন না। তিনি অস্তেই গিয়েছেন। চলো যাওয়া যাক।"

আজ মধ্যরাতে হরিশ্চন্দ্রের পিসিমাগণের আবির্ভাব ঘটল একটু অন্য স্টাইলে। কানা পিসি ছাদের দিক থেকে বাতাসের অদৃশ্য সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে নামলেন। খোঁড়া পিসি যেন বাতাসের দরজা ঠেলে ঢুকলেন। কুঁজো পিসি যেন সুড়ঙ্গপথ ধরে পাতাল

থেকে উঠে এলেন। হরিশ্চন্দ্র একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললেন, "পিসিমাগণ, আজ সব ভেন্ন ভেন্ন হয়ে উদয় কেন?"

কানা পিসি বলে, "আর বলিস না বাছা, প্রাণের ভয় কার নেই বল! ওই মুখপোড়া নাদু মালাকার গতকাল সন্ধেবেলা তিনতলার চিলেকোঠায় আমরা যখন চুল আঁচড়াচ্ছি, তখন হাঁড়ি নিয়ে হামলে পড়েছিল। ধরে ফেলে আর কী। কী আস্পর্ধা বল তো! আমরা তো আর হ্যাতা-ন্যাতা মানুষ নই রে বাপু, স্বয়ং রাজাধিরাজের পিসি! শিঙ্গি-মাগুর মাছ তো নই যে, হাঁড়িতে পুরে জিইয়ে রাখবে!"

হরিশ্চন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তা আপনারা কী করলেন পিসিমাগণ?"

খোঁড়া পিসি বলে, "সেই তো বাছা, কী বিপদেই যে পড়েছি। তিনজন বুদ্ধি করে আয়নায় ঢুকে পড়েছিলুম বলে বাঁচোয়া।"

হরিশ্চন্দ্র ভ্রু কুঁচকে বললেন, "আয়না! আয়নায় কি ঢোকা যায়?"

কুঁজো পিসি বলে, "আয়নায় যে ঢোকা যায়, তা কি আর আমাদেরই জানা ছিল বাপ। কিন্তু দিব্যি ঢুকে গেলুম যে। নাদু কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে চলে গেল।"

"আর আয়নাটা?"

"সে আছে।"

"কীরকম আয়না পিসিমাগণ? আমি যতদূর শুনেছি, আয়নায় ভূত-প্রেতের ছায়া পড়ে না।"

কানা পিসি বলে, "তা ঠিকই শুনেছিস বাপু, এই অবস্থা হওয়ার পর থেকে চেহারার কী ছিরি হয়েছে, তা দেখার জন্য মনটা বড় আঁকুপাঁকু করত। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল যে,

রাজবাড়ির কোনও আয়নাতেই আমাদের ছায়া পড়ত না। তাই মনে বড় দুঃখ ছিল। তারপর একদিন তোষাখানার তাকে এই আয়নাটা পেলুম। দিব্যি আয়না। দেখলুম, তাতে আমাদের বেশ ছায়া পড়ছে। তা বাপু মুখের ছিরি যাই হোক, দেখতে কার না ইচ্ছে করে বল! এই আয়নাটা হয়ে পর্যন্ত আমাদের একটা দুঃখ তো ঘুচেছে! এখন ওই বজ্জাত নাদু মালাকারের একটা ব্যবস্থা কর বাবা। কবে ধরে তিনজনকেই হাঁড়িতে পোরে, সেই ভয়ে আমরা এখন ভেন্ন ভেন্ন থাকছি।"

হরিশ্চন্দ্র ভাবিত হয়ে বললেন, "হুঁ, খুবই দুশ্চিন্তার কথা পিসিমাগণ। আমি এখন বুড়ো হয়েছি। দৌড়ঝাঁপ করতে পারি না। ঢাল-তলোয়ার তুলতে পারি না। চারদিকে চোখ রাখতে পারি না।"

কুঁজো পিসি ঝংকার দিয়ে বলে, "আ মোলো, রাজার ছেলে আবার ওসব কবে করেছে। তোর পাইক-বরকন্দাজ দিয়ে মুখপোড়াটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ঘা কতক দে না। এই নে বাবা, আরও দশখানা গিনি রেখে যাচ্ছি। ভাল-মন্দ খাস।"

সকালে উঠে বিছানায় দশখানা গিনি পেলেন হরিশ্চন্দ্র। পিসিমাদের হাত ক্রমেই দরাজ হচ্ছে। বলতেই হবে যে, নাদু মালাকার বেশ উপকারী লোক। তার কারণেই পিসিমাগণ কৃপণের ধন একটু-একটু করে ছাড়ছেন। বেঁচে থাকো বাবা নাদু মালাকার।

দোতলা থেকে তিনতলার ছাদে ওঠার সিঁড়ি বছর দশেক আগে অনেকটা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। কয়েক ধাপ আছে, আবার কয়েক ধাপ নেই, আবার কয়েক ধাপ আছে, এইরকম আর কী। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার চেষ্টা অতীব বিপজ্জনক। তাই

হরিশ্চন্দ্র সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কী করে তিনতলায় ওঠা যায়, তার উপায় ভাবছিলেন।

এমন সময় পিছন থেকে খুব বিনয়ের সঙ্গে কেউ বলল, "ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ি ভাঙা কি উচিত কাজ হবে মহারাজ?"

গলাটা খুবই চেনা-চেনা লাগল হরিশ্চন্দ্রের। কিন্তু পিছন ফিরে যাকে দেখলেন, তিনি সাদা দাড়ি-গোঁফওলা একজন বুড়ো মানুষ। হরিশ্চন্দ্র চিন্তিত ভাবে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন, "সিঁড়ি ভাঙতে যখন ভাঙা সিঁড়ি ছাড়া অন্য উপায় নেই, তখন সিঁড়ি না ভেঙে আর কী করা যাবে।"

"সেক্ষেত্রে ভাঙা সিঁড়ি যদি আরও ভেঙে পড়ে, তা হলে যে উদ্দেশ্যে সিঁড়ি ভাঙা, তা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে রাজামশাই! সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে চাইলেই তো হবে না। সিঁড়ি ভেঙে পড়লে যে উপরে ওঠার বদলে নীচে নেমে আসতে হবে। আর সিঁড়ি ভাঙার সঙ্গে হাত-পা ভাঙাও বিচিত্র নয়।"

হরিশ্চন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ি ভাঙা বেশ বিপজ্জনক কাজ।"

বুড়ো লোকটা বলল, "চিন্তা করবেন না মহারাজ, ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ি ভাঙার লোক হাতেই রয়েছে। সে সিঁড়ি না ভেঙেই সিঁড়ি ভাঙতে পারে।"

"তার মানে কী, সে সিঁড়ি ভাঙবে, কিন্তু সিঁড়িও ভেঙে পড়বে না?"

"যে আজ্ঞে। ভাঙা ভাঙা সিঁড়ি দিয়েও সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওঠা-নামা যায়। তবে তার জন্য ওস্তাদ সিঁড়ি-ভাঙিয়ে চাই। কিন্তু তাকে দিয়ে এই সিঁড়ি ভাঙানোর উদ্দেশ্য কী মহারাজ?"

হরিশ্চন্দ্র আমতা আমতা করে বললেন, "উদ্দেশ্যটা তেমন

কিছু নয়। তিনতলার চিলেকোঠায় একটা হাত-আয়না পড়ে আছে, সেটা নামিয়ে আনতে হবে।”

এ কথায় বুড়ো মানুষটার চোখদুটো যেন পটাং করে গোল হয়ে গেল। লোকটা ভারী উত্তেজিত হয়ে বলল, “আয়না মহারাজ! আয়না? ঠিক শুনছি তো?”

“হ্যাঁ মশাই, সামান্য একটা আয়না।”

“সামান্য আয়না মহারাজ? পৃথিবীর কোনও আয়নাকেই আমাদের সামান্য বলে মনে করা উচিত নয় মহারাজ। আয়না খুবই গুরুতর জিনিস।”

হরিশ্চন্দ্র লোকটার দিকে খুব ঠাহর করে চেয়ে বললেন, “মশাই, গলাটা চেনা-চেনা ঠেকছে, কিন্তু মুখটা চেনা লাগছে না তো!”

বুড়ো মানুষটা বলল, “গলা যখন ধরা পড়েছে, মুখও পড়বে মহারাজ।”

এই বলে লোকটা পিছু ফিরে ডাকল, “এসো হে সুধীর।”

থামের আড়াল থেকে একটা বেঁটেখাটো লোক বেরিয়ে এসে হরিশ্চন্দ্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

হরিশ্চন্দ্র একটু অবাক হয়ে বললেন, “এ লোকটি কে?”

বুড়ো মানুষটি বলল, “এ একজন চোর, মহারাজ। এর নাম সুধীর গায়েন।”

হরিশ্চন্দ্রের একগাল মাছি। থতমত খেয়ে বললেন, “চোর! ঠিক শুনলাম তো! চোর বললেন নাকি?”

“ঠিকই শুনেছেন। সুধীর একজন বেশ পাকা চোর। চোরদের আপনি খুব একটা অপছন্দ করেন না তো!”

হরিশ্চন্দ্র একটু ভাবিত হয়ে বললেন, “তা চোরই বা খারাপ কী? ঠিকমতো ভেবে দেখলে আগেকার রাজা-জমিদাররাও তো

আসলে চোর-ডাকাতই ছিলেন। অন্যের রাজ্য লুঠপাঠ করতেন, রাজকন্যাদের হরণ করতেন। না বাপু, আমি চোরদের তেমন অপছন্দ করি না। আমার ঠাকুরদার তো একজন মাইনে করা চোর ছিল। তার নাম গোপাল গায়েন।”

সুধীর আর একবার হরিশ্চন্দ্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, “আজ্ঞে, তিনি আমার বাবার শ্রদ্ধেয় ঠাকুরদা।”

হরিশ্চন্দ্র খুশি হয়ে বললেন, “তা হলে তো তুমি বংশানুক্রমিক চোর। চুরি তো তোমার রক্তে হে।”

মলিন মুখে মাথা নেড়ে সুধীর গায়েন বলে, “না মহারাজ, আমাকে কুলাঙ্গার বললেও অত্যুক্তি হয় না, কোনও কাজেই শেষরক্ষা করতে পারি না। এই তো কাল রাতেই মন্টুরাম সিংহের বাড়ি থেকে অনেক কসরত করে মদন তপাদারের বাক্সটা বের করে আনলাম, কিন্তু শেষরক্ষে হল কই? চৌপথীর মোড়ে একটা ষণ্ডা মাথায় ডান্ডা মেরে নিয়ে গেল।”

হরিশ্চন্দ্র একটু আঁতকে উঠে বললেন, “সর্বনাশ! সেই লকেটখানাও হাতছাড়া হয়েছে নাকি?”

বুড়ো মানুষটি বলে, “যে আজ্ঞে। তবে কিনা শুধু লকেটে কোনও কাজ হবে না। সঙ্গে আয়নাখানাও চাই। লকেট আর আয়নার সম্পর্ক কেমন জানেন? এই যেমন সজনে ডাঁটার সঙ্গে কুমড়ো, নিমের সঙ্গে বেগুন, পোস্তর সঙ্গে আলু। সুতরাং লকেটওলা আয়নার খোঁজে এল বলে।”

হরিশ্চন্দ্র একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, “সেটা কি ভাল হবে বাপু? সে তো আর লোক ভাল নয়।”

বুড়ো মানুষটি দুঃখের সঙ্গে বলে, “ভাল লোক বড় কমে যাচ্ছে মহারাজ।”

“তা হলে উপায়?”

“উপায় আপনার হাতে মহারাজ। আপনার গুজগুজ আর ফিসফাসদের সঙ্গে একটু কথা কয়ে দেখুন।”

হরিশ্চন্দ্র একটু অবাক হয়ে বলেন, “গুজগুজ আর ফিসফাস! ওহে, দাড়িগোঁফের আড়ালে ওটা কি হিরু তপাদার নাকি তুমি?”

“যে আজ্ঞে।”

হিরু তার দাড়ি-গোঁফ, পরচুলা খুলে ফেলে হরিশ্চন্দ্রকে একটা প্রণাম করে বলল, “মহারাজ, সত্যিই কি আয়নার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে?”

হরিশ্চন্দ্র চিন্তিত মুখে বললেন, “গুজগুজ আর ফিসফাস শুনে তাই তো মনে হয়। দেখাই যাক।”

সুধীর ভাঙা সিঁড়িটা একবার দেখে নিয়ে টক করে কয়েকটা ধাপ তড়তড় করে উঠে মস্ত ফাঁকটার কাছে পৌঁছে রেলিং-এর উপর উঠে দিব্যি প্রথম চাতালটায় পৌঁছে গেল। তারপর পরের ধাপগুলো উঠবার মুখেই হঠাৎ ছাদের দিক থেকে শাঁই করে একটা আধলা ইট নেমে এল তার দিকে। ‘বাপ রে’ বলে দু’ পা পিছিয়ে এল সুধীর।

“মহারাজ, ছাদ থেকে কে যেন ঢিল ছুড়ছে!”

মহারাজ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, “বটে!”

সুধীর ডিঙি মেরে ছাদের দিকটা দেখবার চেষ্টা করছিল। অমনি আরও চার-পাঁচটা বড় বড় ঢিল দমাদম এসে পড়তে লাগল সুধীরের আশপাশে। একটা ঢিল তার হাঁটুতেও লাগল।

সুধীর পট করে রেলিং বেয়ে নেমে এসে হাঁটু চেপে বসে পড়ে বলল, “মহারাজ, দেখলেন তো, আমি শেষরক্ষা করতে পারি না! আমার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তা আমি জানি। শেষ

পর্যন্ত বটতলায় তেলেভাজার দোকান দেওয়া ছাড়া আমার আর গতি নেই।”

হিরু অবাক হয়ে বলে, “কিন্তু ছাদ থেকে ঢিলটা ছুড়ছে কে মহারাজ? ছাদে তো কেউ থাকে না!”

হরিশ্চন্দ্র সখেদে বললেন, “এ বাড়িতে যে কে থাকে আর কে থাকে না, তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না বাপু। তবে আজকের মতো রণে ভঙ্গ দাও তোমরা। গুজগুজ আর ফিসফাসকে একটু ঠান্ডা করে না নিলে কাজ আদায় করা শক্ত হবে। তাঁরা বড় রেগে আছেন।”

“যে আজ্ঞে, মহারাজ।”

মাঝরাতে ঘুম ভাঙা আর তারপর নানা কিম্ভূত ব্যাপার দেখা হরিশ্চন্দ্রের একরকম অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তিনি মনে মনে একরকম তৈরিই থাকেন।

কিন্তু আজ রাত দেড়টার সময় যা ঘটল, তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। বেশ ফুরফুরে ঘুম হচ্ছিল তাঁর। হঠাৎ মাথায় একটা ঠান্ডা আর শক্ত জিনিস এসে ঠেকল। চটকাটা ভেঙে দ্যাখেন, সামনে কালো কাপড়ে মুখ-মাথা ঢাকা একটা লোক তাঁর মাথায় একটা পিস্তল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হরিশ্চন্দ্রও তো কেঁপে-ঝেঁপে অস্থির। কোনওক্রমে বললেন, “কে তুমি? কী চাও বাপু?”

“আয়নাটা।”

“আয়না! তা এ বাড়িতে আয়নার অভাব কী? নিয়ে গেলেই হয়।”

“চালাকি করবেন না, ঠুকে দেব। কথা না বাড়িয়ে আয়নাটা দিয়ে দিন। আমি জানি, মদন তপাদারের আয়না আপনার কাছে আছে।”

ঠিক এই সময় কানা, খোঁড়া আর কুঁজো পিসি বেশ হেলেদুলে হাসি হাসি মুখ করে ঢুকে দিব্যি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল।

কানা পিসি আহ্লাদের গলায়ই বলে, "দেখলি তো হরি, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে কি না! একটা নিঘিন্নে চোরকে আমাদের সাধের আয়নাটা চুরি করতে লাগালি! তোর পাপের ভয় নেই? না কি শাপশাপান্ত গেরাহ্যি করিস না? এখন এই মিনসে যদি তোর বুকে গুলি ঠুসে দেয়, তা হলে তো তোর পাপেরই শাস্তি হবে নাকি?"

খোঁড়া পিসি বলে, "ওরে, তোর পিসিরা কি ভেসে এসেছে? তাদের একটু সাধআহ্লাদ থাকতে নেই? রুজ পাউডার মাখছি না, পমেটম ঘষছি না, শুধু মাঝেমধ্যে আয়নায় একটু মুখ দেখা! বলি, তাও তোর সইল না?"

কুঁজো পিসি ফঁৎ করে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, "এই যে তোকে সোনাদানা বের করে দিচ্ছি, ভালমন্দ খেতে বলছি, তোর খোঁজখবর রাখছি, বাবা-বাছা বলছি, এর কি কোনও দাম নেই রে হরি? বলি রক্তের সম্পর্কটাও কি মানতে নেই? এই মড়াখেকো গুন্ডাটার হাতে যদি মরিস, তা হলে তোর গতি কী হবে বল তো?"

লোকটা তাঁর কপালে পিস্তলের নলের একটা জোর খোঁচা দিয়ে বলল, "এই যে রাজামশাই, শুনতে পাচ্ছেন?"

হরিশ্চন্দ্র ককিয়ে উঠে বললেন, "শুনেছি বাপু, শুনেছি। একটু রোসো। বুড়ো বয়সে নড়াচড়া করতেও তো সময় লাগে বাপু। হাড়ের জোড়ে জোড়ে ব্যথা, আধিব্যাধিরও কি শেষ আছে?"

"আমার হাতে বেশি সময় নেই। তাড়াতাড়ি করুন।"

কানা পিসি বলল, "দে না বন্দুকের ঘোড়াটা টিপে। বুঝুক মজা।"



খোঁড়া পিসি বলে, "মিনসেটা যেন কী! ম্যাদামারা।"

কুঁজো পিসি বলল, "আজকালকার গুন্ডাগুলোও তেমনি। হাঁদাগঙ্গারাম।"

হরিশ্চন্দ্র কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠতে গিয়েই অম্বুরি তামাকের গন্ধটা পেলেন। দেখলেন মহিমচন্দ্র চেয়ারে বসা। রক্তচক্ষুতে লোকটার দিকে চেয়ে বাঘা গর্জনে বললেন, "বেয়াদবটা কে রে হরি?"

হরিশ্চন্দ্র মিনমিন করে বলেন, "তা কি আর চিনি?"

"ধরে দুটো রদ্দা দে না। তোকে যে ছেলেবেলায় মাইনে করা কুস্তিগির রেখে কুস্তি শিখিয়েছিলুম, তা কি ভুলে গেলি?"

ঠিক এই সময় আরও এক লম্বা চওড়া রাজকীয় পুরুষ ঘরে ঢুকে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "এত আস্পর্ধা! আমার বংশধরের গায়ে হাত! ওরে ও হরি, ওটা তিনশো বছরের পুরনো খাট। ওর বাজুতে অস্ত্র লুকোনো আছে। উপরের পিতলের লোহার বলটা এক প্যাঁচ ঘুরিয়ে টেনে তুললেই অস্ত্র বেরোবে।"

হরিশ্চন্দ্র চিনলেন। ইনি তাঁর এক পূর্বপুরুষ প্রতাপচন্দ্র, এঁর ছবি দরবারে ঝোলানো আছে।

হরিশ্চন্দ্র বাজুর পিতলের বলটা আঁকড়ে ধরে উঠলেন এবং উঠবার সময় সেটাতে প্যাঁচটাও মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলটা খট শব্দ করে একটু আলগা হয়ে গেল বলে টের পেলেন হরিশ্চন্দ্র। দাঁড়িয়েই লহমাও দেরি না করে টান দিতেই একটা লম্বা দোধার তরোয়াল লকলক করে উঠে এল হাতে।

এখনও যে তাঁর এত তৎপরতা আছে, তা জানাই ছিল না হরিশ্চন্দ্রের, আর লোকটাও বোধহয় হঠাৎ একটা তরোয়ালের আবির্ভাব দেখে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। সে নড়বারও সময় পেল না, হরিশ্চন্দ্রের চালানো তরোয়াল বিদ্যুতের মতো

বেগে গিয়ে লোকটার কবজিতে বসে গেল। পিস্তলটা ছিটকে গেল হাত থেকে, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। লোকটা 'বাপ রে' বলে একটা আর্তনাদ করে কবজি চেপে ধরে মেঝেয় বসে পড়ল।

প্রতাপচন্দ্র হুকুম দিলেন, "গলাটা কেটে ফেল! ফেল কেটে!"

হরিশ্চন্দ্র ততটা করলেন না। তবে ঘরের কোণ থেকে তাঁর মোটা লাঠিটা এনে লোকটার মাথায় জোর এক ঘা বসিয়ে দিলেন। লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

হরিশ্চন্দ্র এবার তাঁর পিসিমাদের দিকে চেয়ে রোষকষায়িত লোচনে বললেন, "পিসি হয়ে ভাইপোর সঙ্গে এরকম ব্যবহার! দাঁড়াও, কালই নাদু মালাকারকে ডাকিয়ে আনাচ্ছি।"

তিন পিসি ভারী জড়সড় হয়ে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। কানা পিসি শুকনো মুখে বলল, "তা আর করতে হবে না বাছা, তোর জিনিস দিয়ে দিচ্ছি।"

বলেই পিসিরা উধাও হল বটে, কিন্তু একটু পরেই হরিশ্চন্দ্রের বিছানার উপর আয়নাটা এসে ঠুক করে পড়ল।

ডাকাডাকিতে রাখহরি এল, মোক্ষদা এল, নগেন এল। তার পিছু পিছু এল হিরু তপাদার আর সুধীর গায়েন। সকলেরই চক্ষু চড়কগাছ, "মহারাজ, করেছেন কী? একা হাতে এরকম একটা গুন্ডাকে ঘায়েল করেছেন?"

হরিশ্চন্দ্র বললেন, "ওরে বাপু, রাজার রক্তটা তো এখনও শরীরে আছে, না কি?"

কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা লোকটার দিকে চেয়েই সুধীর চেঁচিয়ে উঠল, "এ তো কালোবাবু!"

হিরু বলল, "শুধু কালোবাবুই নন, এঁর আরও একটা পরিচয়

আছে। সেটা ঘোমটা সরালেই বোঝা যাবে।”

ঘোমটা সরাতেই কালো দাড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন একটা মুখ বেরিয়ে পড়ল। আর তাই দেখে সুধীর ডুকরে উঠল, “এ যে বাঁকা মহারাজ!”

হিরু বলে, “এঁর তিন নম্বর পরিচয় হল, নাম খগেন নন্দী, আমার বাবার কাছে ছোকরা বয়সে ম্যাজিক শিখতে আসত! সম্ভবত তখনই আয়নার কথাটা জেনে যায়। মহারাজ, বলেছিলুম কি না আয়নার খোঁজে এ লোক আসবেই এখানে। ওই দেখুন ওর গলায় ধুকধুকিটাও রয়েছে। কিন্তু আপনার পিসিমারা তো আয়নাটা হাতছাড়া করতে রাজি নয় মহারাজ! তা হলে কী হবে?”

হরিশ্চন্দ্র বিছানা থেকে আয়নাটা তুলে হিরুর হাতে দিয়ে বললেন, “এসব বিপজ্জনক জিনিস। সাবধানে রেখো বাপু। বেশি নাড়াঘাঁটা করতে যেয়ো না যেন।”

হিরু বলল, “পায়ের ধুলো দিন রাজামশাই। আপনার মতো মানুষ আমি জীবনে আর একটাও দেখিনি।”



গোবিন্দ ঘোষ যে মন্টুরামকে হিংসে করে, এটা মন্টুরাম অনেকদিন ধরেই জানেন। লোকে হিংসে করলে অবশ্য মন্টুরাম অখুশি হন না। বরং খুশিই হন। এত যে টাকা-পয়সা রোজগার করছেন, এই যে এত গাড়ি বাড়ি, সম্পত্তি করলেন, এই যে এত সোনাদানা, ঘরে দামি দামি সব জিনিস, এত কাজের লোক, এসব দেখে যদি লোকের হিংসেই না হবে তা হলে এত পরিশ্রমই তো বৃথা। লোকে হিংসে করে বলেই তো সুখ। কিন্তু হিংসে করতে গিয়ে গোবিন্দ ঘোষ যে তাঁর ঘরে চোর ঢোকাবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। গতকালই কানাই দারোগা গোবিন্দ ঘোষকে পিলে-চমকানো জেরা করেছেন এবং তাঁর ধারণা হয়েছে, এই চুরির সঙ্গে গোবিন্দর একটা সম্পর্ক আছে। তবে গোবিন্দকে গ্রেফতার করা হয়নি এখনও। আরও সাক্ষ্যপ্রমাণ পেলে সেটাও হবে।

ফলে গোবিন্দ ঘোষের বাড়িতে মড়াকান্না উঠেছে। অরন্ধন চলছে। গোবিন্দ ভয়ে কাতর হয়ে শয্যা নিয়েছেন, কাজে বেরোচ্ছেন না। এসব খুবই আহ্লাদের খবর বলেই মন্টুরামের মনে হচ্ছে। বিস্তর সোনাদানা এবং মদন তপাদারের বাক্স চুরি হওয়ায় তাঁর ক্ষতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সমুদ্র থেকে এক মগ জল তুললে কি সমুদ্র তা টের পায়? চুরিটা তাই তাঁকে বেশি দাগা

দিতে পারেনি। বরং গোবিন্দ ঘোষের দুর্দশায় তাঁর ভারী আনন্দ হচ্ছে।

কিন্তু মুশকিল হল, মন্টুরামের দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। একজন তাঁর বউ হরিমতী, অন্যজন দু' নম্বর মন্টুরাম।

হরিমতী সকাল থেকেই ঘ্যানঘ্যান করছেন, "ওগো, ওরা গরিব মানুষ, ওদের না আছে পয়সার জোর, না আছে ক্ষমতা। চোর ওদের বাড়ি বয়ে এসেছিল, তাতে ওদের দোষ কী বলো! গোবিন্দবাবু ভারী নিরীহ মানুষ, তুমি আর ওদের উপর চাপ দিয়ো না। লোককে ক্ষমাঘেন্না করতে শেখো।"

আর দু'নম্বর মন্টুরামের সঙ্গে সকাল থেকেই তাঁর দফায় দফায় ঝগড়া চলছে।

বেলা আড়াইটেয় যখন মন্টুরাম তাঁর অফিসঘরে বসে ব্যাবসার হিসেবপত্র দেখছেন, তখনই দু'নম্বর মন্টুরাম ফের হাজির হয়ে বলল, "মন্টুরাম, নিজেকে তুমি কী ভাবো বলো তো! তোমার টাকা আছে আর প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে বলেই কি তার জোরে তুমি সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসতে চাও? তুমি রাজা না উজির?"

"দ্যাখো দু'নম্বর, আমি আইন নিজের হাতে নিইনি। যা করার পুলিশ করছে, আর সেটা আইন মেনে।"

"কাকে ভাঁওতা দিচ্ছ? কানাই দারোগা তোমার অঙ্গুলিহেলনে চলেন, এ সবাই জানে। আইন-আদালত তো তোমার পকেটে! তুমি হলে একজন হৃদয়হীন পাষণ্ড। ভাল চাও তো গিয়ে গোবিন্দ ঘোষের কাছে ক্ষমা চেয়ে এসো।"

মন্টুরাম অবাক হয়ে বললেন, "ক্ষমা চাইব কেন? গোবিন্দ ঘোষকে তো আমি অপমান করিনি।"

তাঁর ম্যানেজার উমাপদ এসে পড়ায় ঝগড়াটা আর বেশি

দূর চলল না বটে, কিন্তু দু'নম্বর মন্টুরাম ছাড়ার পাত্র নন। এবং মন্টুরাম জানেন, ক্রমে ক্রমে হরিমতী আর দু' নম্বর মন্টুরাম মিলে তাঁকে একদিন পেড়ে ফেলবেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি রণে ভঙ্গ দিয়ে ফেলবেন। আর এই কারণেই মন্টুরামের মনটা আজকাল বেজায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে এবং তিনি সারা দিনে অনেক দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ঘণ্টায় অন্তত দশটা-বারোটা তো হবেই।

বিকেলের দিকটায় মন্টুরামের পেটে বায়ু হয়ে উদ্গার উঠতে লাগল। ভারী অসোয়াস্তি। অকারণে ঘামও হচ্ছে। নিজের নাড়ি দেখলেন মন্টুরাম। কিছু বুঝতে পারলেন না।

দু'নম্বর মন্টুরাম প্রম্পটারের মতো আড়াল থেকে বলল, "পেটে বায়ু তো হবেই হে মন্টুরাম, মানুষের অভিশাপও তো আছে। গিয়ে দেখে এসো, গোবিন্দ ঘোষের বাড়িতে আজ কেউ দাঁতে দানাটাও কাটেনি। উপোস করে পড়ে আছে। লোকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, এরা হল চোরের মাসতুতো ভাই। কী অপমানটাই হচ্ছে ওদের!"

"তা কী করতে হবে?"

"গিয়ে একটু মিষ্টি কথা বলে এলেও তো হয়। তুমি মানী লোক, ওদের বাড়ি গিয়ে দাঁড়ালে ওরা ধন্য বোধ করবে।"

মন্টুরাম খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "তাতে আমার পেটের বায়ু কমবে কি?"

"ওরে বাপু, ওইটেই তো তোমার বায়ুর ওষুধ!"

"আর আমার অত সোনাদানা যে চলে গেল! মদন তপাদারের বাক্সটা হাতছাড়া হল!"

"মন্টুরাম, ওই সোনাদানার নিরানব্বুই ভাগই হল বন্ধকি সোনা। চড়া সুদে বন্ধক দিয়ে কয়েকশো লোক আর ছাড়াতে পারেনি। ওই সোনায় দীর্ঘশ্বাস মিশে আছে। ও গিয়ে বেঁচে

গিয়েছ হে। আর মদন তপাদারের বাক্স তো তোমার জিনিস নয়। দুঃখ করছ কেন?”

সন্ধের মুখে মন্টুরাম উঠলেন। দোকান থেকে এক হাঁড়ি ক্ষীরকদম্ব কিনে গুটিগুটি গোবিন্দ ঘোষের বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়লেন।

দরজা খুলে গোবিন্দ হাঁ, “মন্টুরাম! তুমি?”

“মাফ করে দিয়ো ভাই। সকালে তোমার বড্ড হেনস্থা হয়েছে, ওসব মনে রেখো না। কাল আমার ছোট মেয়ের জন্মদিন, তোমাদের সকলের নেমন্তন্ন রইল।”

গোবিন্দ ঘোষ হাউহাউ করে কেঁদে মন্টুরামকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর চোখের জল মুছে বললেন, “এসো ভাই, গরিবের বাড়িতে অন্তত এক কাপ চা খেয়ে যাও।”

মন্টুরাম অনুভব করলেন, তাঁর পেটের বায়ু নেমে গিয়েছে। আর এটা তাঁর চা খাওয়ারই সময়। তাই বললেন, “তা মন্দ কী! আজ বিকেলের চা-টা বরং তোমার সঙ্গেই হয়ে যাক।”

“বুরুচ, আমাকে চিনতে পারছ?”

“আমার অভিবাদন নাও হিরু তপাদার। তুমি বড় হয়ে গিয়েছ।”

“হ্যাঁ বুরুচ, আমি আর ছোট্ট খোকাটি নেই।”

“তাই দেখছি হিরু তপাদার। তোমার চোখে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা। তোমার নির্ভীক মুখশ্রী। তুমি একজন ভাল মানুষ।”

“আমাকে এখন কী করতে হবে বুরুচ, তুমি বলে দাও।”

“মধ্যরাতে নীল আকাশ থেকে একটা বিদ্যুতের শিখা মাটিতে নেমে আসবে। চারদিক আলোয় আলোময় হয়ে যাবে। ভোর হয়েছে ভেবে পাখিরা ডাকাডাকি করে আকাশে উড়তে থাকবে।

তোমাদের মন্দিরে যেমন ঘণ্টা বাজে, তেমনি এক ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাবে তুমি। কুয়াশা উঠে আসবে ঘাস থেকে, কুয়াশা নেমে আসবে আকাশ থেকে, এক মায়া আবরণে ঢেকে যাবে চারদিক। তখন আলোর ঘেরাটোপ থেকে আমাদের যোদ্ধারা বেরিয়ে আসবে।"

"তারা কি ভয়ংকর বুরুচ?"

"তারা ভয়ংকর। কিন্তু তোমার কাছে নয়। তারা জানে হিরু তপাদার একজন বন্ধুর নাম। হিরু তপাদার শত্রু নয়।"

দু'দিন পর এক মধ্যরাতে হিরুর গলার লকেটে একটা মৃদু কম্পন শুরু হল। ঘুম ভেঙে উঠে বসল হিরু। তবে কি সময় হয়েছে? হিরু কান পেতে শুনতে পেল, বহু দূর থেকে একটা বিষণ্ণ ঘণ্টার ধ্বনি ভেসে আসছে। হিরু উঠে পড়ল। রাজবাড়ির সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মেঘহীন পরিষ্কার আকাশে আঙুরের থোকার মতো রাশি রাশি তারা ঝুলে আছে। চরাচর স্তব্ধ হয়ে আছে। ঝিঁঝিপোকারও শব্দ নেই। শুধু ঘণ্টা বাজছে দূরে।

হঠাৎ আলোর বল্লমের মতো এক তীব্র বিদ্যুৎশিখা অন্ধকার চিরে চোখ ধাঁধিয়ে নেমে এল নীচে। আর ঘাস থেকে, মাটি থেকে, আকাশ থেকে পুঞ্জ-পুঞ্জ কুয়াশা পাকিয়ে উঠতে লাগল চারদিকে। লাল, নীল, হলুদ, কমলা, সবুজ। চারদিক এক রামধনু-কুয়াশায় ঢেকে গেল। চারদিকে পাখিদের ওড়াউড়ির শব্দ পাচ্ছে সে, ভোর ভেবে ডাকাডাকি করছে পাখিরা। বাগানে ভাঙা ফোয়ারার পাশে আলোর স্তম্ভটি স্থির হয়ে আছে।

আলোর আবরণ থেকে একে একে দশজন যোদ্ধা বেরিয়ে এল। বিশাল ধাতব শরীর ঝকঝক করছে। তারা এসে সিঁড়ির নীচে হিরুর মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর নতজানু হয়ে সকলে

একসঙ্গে এক সুরেলা গলায় বলে উঠল, "আমাদের অভিবাদন হিরু তপাদার।"

হিরু জোড়হাতে বলল, "আমি সামান্য এক মানুষ। এই নাও তোমাদের জিনিস ফিরিয়ে দিলাম।"

সামনের অগ্রবর্তী যোদ্ধা তার ধাতব হাত বাড়িয়ে আয়না আর লকেটটা নিয়ে একটা ছোট বাক্স হিরুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "তোমার জন্য উপহার হিরু তপাদার। দয়া করে গ্রহণ করো।"

যোদ্ধারা উঠে দাঁড়াল, একটু একটু করে পিছিয়ে আলোর স্তম্ভের মধ্যে মিলিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ দপ করে নিভে গেল আলো।

গোটা ঘটনাই যেন স্বপ্ন-স্বপ্ন লাগছিল হিরুর। এরা কারা? এরা কেমন মানুষ? সম্মোহিতের মতো নিজের ঘরখানায় ফিরে এসে সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর হাতের বাক্সটা খুলল। তারপর অবাক হয়ে দ্যাখে, বাক্সের মধ্যে অবিকল একই রকম আর একটা আয়না!

ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ আয়নাটার দিকে চেয়ে থেকে ঢাকনাটা খুলতেই একজন অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী চমৎকার হেসে বলে, "সুপ্রভাত হিরু তপাদার। এই জাদু-আয়না তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে। প্রথম কথা, এই আয়নাকে শুধু একটা আয়না হিসেবে ব্যবহার করতে পারো। শুধু আয়না কথাটা উচ্চারণ করলেই এটা সাধারণ আয়না হয়ে যাবে। আর যদি অন্য কোনও জিনিসের সন্ধান চাও, তা হলে আয়না তারও সন্ধান দেবে। তুমি কি গুপ্তধন চাও? তা হলে একবার বলো, গুপ্তধন।"

বিস্মিত হিরু একটু হেসে বলল, "গুপ্তধন।"

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার ছবি অদৃশ্য হল। তার বদলে ফুটে উঠল একটা আলোকিত গহ্বরের ছবি। নেপথ্যে সেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর

বলতে লাগল, "এই যে দেখছ, এটি হল রাজবাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণের স্তম্ভটি। ওর ভিতরটা ফাঁপা। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। কয়েকটা ইট সরালেই গহ্বরের সন্ধান পাবে। পনেরো ফুট নীচে ওই দ্যাখো বাক্সভরতি সোনার টাকা, সোনার তৈরি বাসন, সোনার কত গয়না!"

বাস্তবিকই আয়নায় বাক্সগুলো দেখা যাচ্ছে। তারপর ছবি বদলে গেল।

মেয়েটির গলা বলতে লাগল, "এবার বাগানের পিছন দিকে ভাঙা শিবের মন্দিরটা দ্যাখো। ওর পিছনের পুরু দেওয়ালটার ভিতরে রয়েছে তিনটি বড় বড় সোনার মূর্তি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এক-একটা মূর্তির ওজন এক মন করে।"

বাস্তবিকই আয়নায় পাশাপাশি তিনটি মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

"এইবার চলো পুকুরের নীচে, জলের তলায়। ওই দ্যাখো, ঠিক মাঝখানে একটা শ্বেত পাথরের চাঙড় পড়ে আছে। ওটা সরালে...।"

শিহরিত এবং স্তম্ভিত হিরু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আয়না! আয়না!"

ছবি মিলিয়ে গেল। কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হল। আয়নায় ফুটে উঠল তার প্রতিবিম্ব। ঢাকনাটা বন্ধ করে বজ্রাহতের মতো বসে রইল হিরু। এ বড় সর্বনেশে জিনিস। গুপ্তধনের অতুল ঐশ্বর্যের অর্থ হল আবার লোভ জেগে ওঠা, হিংস্রতার উত্থান, ষড়যন্ত্র আর গুপ্তহত্যার নতুন গল্প, হানাহানির বীজ বপন। মানুষের ভিতরকার রাক্ষসটাকে জাগিয়ে তোলা কি ভাল?

ভোরবেলায় সামনের বারান্দায় নরম রোদে পা মেলে দিয়ে হরিশ্চন্দ্র প্রসন্ন মুখে বসে আছেন। শরৎ ঋতু যাই যাই করছে। একটু-একটু করে ঠান্ডা পড়তে লেগেছে। ক'দিন পরেই বাজারে

নতুন ফুলকপি আর লাল আলু উঠবে। বড্ড দাম। তবে কয়েকটা গিনি লুকানো আছে। এক-আধদিন ফুলকপি আর আলু খেলে মন্দ হয় না। নতুন আলু আর ফুলকপির চিন্তায় যখন বিভোর হয়ে আছেন, তখন হিরু তপাদার এসে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের কাছটিতে বসল।

"মহারাজ, এবার যে আমাকে বিদায় নিতে হবে।"

হরিশ্চন্দ্র বিস্মিত হয়ে বলেন, "সে কী! এই তো সেদিন কাজে ঢুকলে! এখনও পয়লা মাসের বেতন পাওনি!"

হিরু হেসে বলে, "আপনার কাছ থেকে বেতনের চেয়েও অনেক বেশি কিছু পেয়েছি।"

হরিশ্চন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তা যাবেটা কোথায়?"

"আমি অনেক দূরে একটা গাঁয়ের স্কুলে ইংরিজি পড়াই। সেখানেই ফিরে যাব।"

হরিশ্চন্দ্র ভ্রু তুলে বললেন, "ইংরিজি পড়াও! বাঃ বাঃ বেশ।"

"একটা কথা মহারাজ। আপনার পিসিমাদের আয়না কেড়ে নেওয়ায় তাঁরা খুব দুঃখ পেয়েছেন বলে শুনেছি।"

"সে আর বোলো না। শাপশাপান্ত করে শেষ করছেন।"

"তাঁদের এই আয়নাটা দয়া করে দিয়ে দেবেন।"

হরিশ্চন্দ্র আঁতকে উঠে বললেন, "আবার আয়নার ফেরে ফেলতে চাইছ নাকি বাপু?"

"ভয় নেই মহারাজ, এটা কেউ ফেরত চাইবে না। তা হলে আমি মহারাজ যাই।"

"এসো গিয়ে।"

হিরু তপাদার প্রণাম করে চলে গেল। হরিশ্চন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে তার গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন। বাড়িটা একটু ফাঁকা লাগবে কি? তা ফাঁকা লাগার অভ্যেস তাঁর আছে।

মাঝরাতে তিন পিসি আয়না পেয়ে এমন কোলাহল করে উঠল যে, হরিশ্চন্দ্রকে নিজের কানে হাতচাপা দিতে হল। কানা পিসি খলখল করে হেসে বলে, "ও হরি, দিলি নাকি আয়নাটা! দিলি?"

কুঁজো পিসি ফোকলা হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কী, বলে, "ও হরি, আর কেড়ে নিবি না তো বাবা? একেবারে দিলি তো?"

খোঁড়া পিসি চোখের জল মুছে ধরা গলায় বলে, "হরি রে, তুই যে আমাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলি বাপ!"

কানা পিসি আয়নায় মুখ দেখে সে কী খুশি! বলে, "ওরে, দ্যাখ দ্যাখ, আমার বয়স যেন কয়েক বছর কমে গিয়েছে! মুখের কোঁচকানো ভাবটা যেন অনেক কম!"

"দেখি দেখি," বলে কুঁজো পিসি আয়নায় মুখ গুঁজে বলে, "ওমা! তাই তো দিদি, আমার গালেও যেন একটু রাঙা রাঙা ভাব। শরীরটা কি একটু ফিরল তা হলে?"

খোঁড়া পিসি হামলে পড়ে বলল, "আ মোলো যা, আমাকেও একটু দেখতে দিবি তো। ওরেব্বাস রে, আমার চোখের কোলে কালিটা আর নেই তো! রংটাও যেন খুলেছে!"

হরিশ্চন্দ্র তিন পিসির কাণ্ড দেখে ভারী তৃপ্তি বোধ করছিলেন। কানা পিসি ঝনাৎ করে একটা থলি হরিশ্চন্দ্রের বিছানায় ফেলে দিয়ে বলল, "নে বাবা, ওতে এক হাজার ভরি গিনি আছে। প্রাসাদের পাঁচিলটা ভাল করে সারিয়ে ফেল তো। আর সিংহদরজায় ফটক লাগাস বাবা। বড্ড ভয়ে ভয়ে থাকি।"

খোঁড়া পিসি বলে, "হ্যাঁ বাবা হরি, ফটকে একজন শক্তপোক্ত

দরোয়ানও মোতায়েন করিস, তার মাইনে আমরা মাসে মাসে তোকে দিয়ে দেব। দেখিস বাবা, নাদু মালাকার যেন এ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে না পারে।"

কুঁজো পিসি বলে, "শেষ বয়সে একটু শান্তিতে থাকতে দিস বাবা। তোর হাজার বছর পরমায়ু হবে।"

কোলাহল করতে করতে পিসিরা উধাও হল।

মাঝেমধ্যে ট্রাপিজের খেলোয়াড়টিও হাজির হয়। এক ঝাড়বাতি থেকে আর এক ঝাড়বাতিতে ঝুল খেতে খেতে বলে, "আমার ছেলেকে আপনার কেমন লাগল মহারাজ?"

হরিশ্চন্দ্র প্রাণ হাতে করে ওই বিপজ্জনক লাফঝাঁপ দেখতে দেখতে বলেন, "তোমার ছেলে ঠিক তোমার মতোই হয়েছে হে তপাদার। তবে তোমার মতো প্রাণঘাতী লাফঝাঁপ করে বেড়ায় না।"

মদন তপাদার হাসতে হাসতে বলে, "আমি গরিব ছিলুম বটে মহারাজ, কিন্তু লোক ভাল ছিলুম।"

কালোবাবু ওরফে বাঁকা মহারাজ ওরফে খগেন নন্দী এখন পুলিশের হেফাজতে। সোনাদানা সব মন্টুবাবু ফেরত পেয়ে গিয়েছেন। সুধীর গায়েন বটতলায় তেলেভাজার দোকান খুলেছে এবং তার ব্যাবসা রমরম করে চলছে।

রাজবাড়ির পাঁচিল মজবুত করে সারানো হয়েছে, সিংহদরজায় লাগানো হয়েছে নতুন লোহার ফটক। একজন গোঁফ-চোমড়ানো তাগড়াই দরোয়ান দিনরাত পাহারা দিচ্ছে। এই দেখে নাদু মালাকার কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে সেই যে ফিরে গিয়েছে, আর আসেনি।

হরিশ্চন্দ্র একজোড়া নরম বিদ্যাসাগরী চটি কিনেছেন, নতুন

জরির একটা পোশাকও হয়েছে তাঁর। আর আমসত্ত্ব দিয়ে দুধও খাচ্ছেন দু'বেলা। সঙ্গে নতুন আলু দিয়ে কচি ফুলকপির ঝোল।

মাঝে-মাঝে হরিশ্চন্দ্রের মনে হয়, না, তিনি সবটাই ভুল দ্যাখেন না, সবটাই ভুল শোনেন না, সবটাই ভুল বোঝেন না এবং সবটাই ভুল বলেনও না।


9 789350 402559

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

মদন তপাদারের বাক্স

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



মদন তপাদারের বাক্স • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ